তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ : মাহ্দি ও দাজ্জাল

মূল

মাওলানা আসেম ওমর

প্রখ্যাত আলেমে দীন, পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং- ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

দ্বিতীয় পর্ব

দাজ্জালের বর্ণনা

দাজ্জালের আলোচনা উম্মতের জন্য একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা দেখে থাকবেন, মুসলিম পরিবারগুলোতে মায়েরা যখন তাদের সন্তানদেরকে অন্যান্য ইসলামি আকিদা ও বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন, তখন দাজ্জাল-বিষয়েও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন শৈশবেই আপনার মায়ের জবানে আপনাকে দাজ্জালের ভয়ানক চিত্র আপনার কচি মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকবে। এটি মুসলিম জাতির মায়েদের সেই প্রশিক্ষণ ছিল, যা সন্তাদেরকে ইসলামি বোধ-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে দিত না। কিন্তু এখন সম্ভবত অবস্থা পালটে যাচ্ছে এবং জাহেলি সভ্যতা আজকের মাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারি থেকে অনেক উদাসীন করে দিয়েছে। তা ছাড়া দাজ্জালের আবির্ভাবের যতগুলো লক্ষণ আছে, তার একটি লক্ষণ হলো, সে-সময় মানুষ দাজ্জালের আলোচনা ভুলে যাবে। কাজেই আপনি যদি নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা রাখেন, তা হলে এর জন্য ঘরে-ঘরে দাজ্জালের আলোচনা অত্যন্ত জরুরি, যাতে আপনার কোলে বেড়ে-ওঠা-বংশধর তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু দাজ্জাল সম্পর্কে শৈশব থেকেই সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারে।

দাজ্জাল সম্পর্কে ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি

দাজ্জাল-বিষয়ক হাদীছগুলো বর্ণনা করার আগে দাজ্জাল সম্পর্কে ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের ধর্মীয় (বর্তমানে বিকৃত) গ্রন্থগুলোতে বিবৃত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দেওয়া আবশ্যক মনে করি। তাতে বর্তমানে আমেরিকা ও অন্যান্য কাফের গোষ্ঠী ইহুদিদের ইঙ্গিতে যা-কিছু করছে, তার প্রেক্ষাপট ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে আসবে।

দাজ্জাল সম্পর্কে ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে ইহুদিদের সম্রাট হবে। সকল ইহুদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসে আবাদ করবে। সমগ্র বিশ্বের উপর ইহুদিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। পৃথিবীতে ইহুদিদের জন্য কোনো শঙ্কা অবশিষ্ট থাকবে না। সকল 'সন্ত্রাসবাদী'কে নির্মূল করে ফেলবে এবং সর্বত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইযাখিলে আছে :

'হে ইহুদীকন্যা, তুমি আনন্দের সঙ্গে চিৎকার দাও। ওহে জেরুজালেমের কন্যা, তুমি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাও। ওই দেখো, তোমাদের রাজা আসছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসছেন। আমি ইউফ্রিম থেকে গাড়িকে আর জেরুজালেম থেকে ঘোড়াকে আলাদা করে ফেলব। যুদ্ধের পালক উপড়ে ফেলা হবে। তার শাসন সমুদ্র থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।' (যাকারিয়া : ৯ : ৯ : ১০)

'অনুরূপভাবে আমি ইসরাইলের প্রতিটি সম্প্রদায়কে সমগ্র পৃথিবী থেকে এনে একত্রিত করব, চাই তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করুক। আমি তাদেরকে তাদেরই ভূখণ্ডে সমবেত করব। এই ভূখণ্ডে আমি তাদেরকে এক জাতির আকারে গড়ে তুলব ইসরাইলের পাহাড়ের উপর, যেখানে একজনমাত্র রাজা তাদের উপর রাজত্ব করবেন।' (ইযাখিল : ৩৭ : ২১ : ২২)

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালে 'আমেরিকান-ইসরাইল পাবলিক এফ্রোজ' কমিটির (এ.আই.পি.এ.সি) টমডাইনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি জানেন, আমি আপনার পুরাতন পয়গম্বরদের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে যাদের উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে। আর আর্মেগডন (তেলাবিব থেকে ৫৫ মাইল উত্তরে এবং তাবরিয়া উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি অঞ্চল) সম্পর্কে একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং লক্ষণও বিদ্যমান। আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, আমরাই কি সেই প্রজন্ম, যারা অনাগত পরিস্থিতিকে অবলোকনের জন্য বেঁচে আছি? আপনি বিশ্বাস করুন, এসব ভবিষ্যদ্বাণী সুনিশ্চিতভাবে সেই যুগটিরই কথা বলছে, আমরা যেটি অতিবাহিত করছি।'

প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮১ সালে চার্চের জেম বেকারের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন, কমপক্ষে বিশ কোটি সৈনিক আসবে প্রাচ্য থেকে। আর পশ্চিমাদের সৈন্যসংখ্যা হবে কয়েক কোটি। রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পর (অর্থাৎ পাশ্চাত্য ইউরোপ) ঈসা মাসীহ (দাজ্জাল) পুনরায় সেই লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালাবে, যারা তাদের নগরী জেরুজালেমকে ধ্বংস করেছিল। তারপর তিনি সেই বাহিনীগুলোর উপর আক্রমণ চালাবেন, যারা মেগডন ও আর্মেগডনের উপত্যকায় সমবেত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জেরুজালেম পর্যন্ত এত রক্ত প্রবাহিত হবে যে, রক্ত ঘোড়ার লাগামের সমান হয়ে যাবে। এসব উপত্যকা যুদ্ধসরঞ্জাম, জীবজন্তু, মানুষের জীবন্ত দেহ ও রক্তে ভরে যাবে।'

পল ফান্ড লে বলেছেন, একটি বিষয় আমার বুঝে আসছে না যে, মানুষ মানুষের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ কীভাবে করবে! কিন্তু সেদিন খোদা মানবীয় স্বভাবকে এই অনুমতি দিয়ে দেবেন যে, তোমরা তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দাও। বিশ্বের উন্নত সবকটি শহর– লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক, লস্‌এঞ্জেল্‌স ও শিকাগো অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে যাবে।'

টিভি বিশেষজ্ঞ হিস্টন বলেছেন, 'বিশ্বের ভাগ্য সম্পর্কে মাসীহে দাজ্জালের ঘোষণা একটি আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্স থেকে প্রচার করা হবে। উক্ত কনফারেন্স স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভির পর্দায় দেখা যাবে।'

প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর মার্ক হেটফিল্ড বলেছেন, পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের পুনরাগমনকে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি যে, এটি মাসীহ (দাজ্জাল) যুগের আগমনের লক্ষণ, যে-যুগে গোটা মানবতা একটি আদর্শ সমাজের কল্যাণে সুখময় জীবন লাভ করবে।

'ফোর্সিং গর্ডস হ্যান্ডস' নামক গ্রন্থের লেখিকা গ্রেস হল গেল বলেছেন, '...আমাদের গাইড কুব্বাতুস-সাখ্‌রার (টুম্‌ স্টোন) প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, আমাদের তৃতীয় হাইকেলটি আমরা ওখানে নির্মাণ করব। হাইকেল নির্মাণে আমাদের সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে। নির্মাণসামগ্রী পর্যন্ত এসে পড়েছে। সেগুলো একটি গোপন স্থানে রাখা হয়েছে। বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান – যেগুলোতে ইসরাইলি কাজ চলছে – হাইকেলের জন্য দুর্লভসব জিনিসপত্র তৈরি করছে। একটি ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান রেশমের সুতা তৈরি করছে। সেগুলো দিয়ে ইহুদি পণ্ডিতদের পোশাক প্রস্তুত করা হবে। (হতে পারে এগুলোই সেই তীজান বা সীজানওয়ালা চাদর, যার উল্লেখ হাদীছে এসেছে)।

লেখিকা আরও লিখেছেন, 'আমাদের গাইড বলল, একথা ঠিক যে, আমরা শেষ সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছি, যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, কট্টর ইহুদিরা মসজিদটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, যার ফলে মুসলিম বিশ্ব আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। এটি হবে ইসরাঈলের সঙ্গে একটি পবিত্র যুদ্ধ। এ-বিষয়টি মধ্যখানে এসে হস্তক্ষেপ করতে মাসীহকে (দাজ্জাল) বাধ্য করবে।'

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে একটি ইসরাইলি সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে হাইকেলে সুলাইমানির চিত্র দেখানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে মুক্ত করা এবং তদ্‌সম্মুখে হাইকেল নির্মাণ করা। সংবাদত্রে বলা হয়েছিল, এই হাইকেল নির্মাণের মোক্ষম সময়টি এসে পড়েছে। সংবাদপত্রে ইসরাইলি সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল, তারা যেন অধর্মীয় ইসলামি দখলদারিত্বকে মসজিদের স্থান থেকে অপসারণ করে। পত্রিকাটি আরও দাবি করেছে, তৃতীয় হাইকেল নির্মাণ খুবই সন্নিকটে।

গ্রেস হল সেন আরও লিখেছেন, 'আমি লেভা ও ব্রাউনের (ইহুদির) আবাসভূমিতে (ইসরাইলে) অবস্থান করি। একদিন সন্ধ্যায় আলাপকালে বললাম, উপাসনালয় নির্মাণের জন্য মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দিলে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। উত্তরে সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত ইহুদি বলল, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। এমন যুদ্ধই তো আমরা কামনা করি। কারণ, সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব। তারপর আমরা সমস্ত আরবকে ইসরাইলের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেব। আর তখনই আমরা আমাদের উপাসনালয়টিকে নতুনভাবে নির্মাণ করব।'

ইলহামের কিতাবের ষোলোতম তথ্যে আছে, ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে। এভাবে প্রাচ্যের সম্রাটগণ অনুমতি পেয়ে যাবে যে, এই নদী পার হয়ে তোমরা ইসরাইল পৌঁছে যাও।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন তাঁর 'ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসকে পরিণত হবে এবং এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসীহ (দাজ্জাল) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেবেন। যেন উল্লেখিত সন পর্যন্ত মাসীহর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর আমেরিকার দায়িত্ব এসব ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর মাসীহ রাজ্য পরিচালনা করবে।

লাখ-লাখ মৌলবাদী খ্রিস্টানের বিশ্বাস হলো, খোদা ও ইবলিসের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধটি তাদের জীবদ্দশাতেই শুরু হবে। তবে তাদের অধিকাংশের কামনা হলো, এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তাদেরকে তুলে নিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক। খ্রিস্টান মৌলবাদীরা সামরিক প্রস্তুতিতে এত সোৎসাহ সহযোগিতা কেন করছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। এই পলিসি দ্বারা তারা দুটি লক্ষ্য অর্জন করছে। প্রথমত, তারা আমেরিকানদেরকে তাদের ঐতিহাসিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে, যেটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এবং যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বাইবেলে বিশ্বাসী লাখ-লাখ ক্রিশ্চান নিজেদেরকে এত জোরালোভাবে 'দাউদি' তথা টেক্সাসের প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে কেন সম্পৃক্ত করছে, এর দ্বারা তার রহস্যও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভিসন থমাস তার এক গ্রন্থে লিখেছেন, 'আরব বিশ্ব খ্রিস্টানদের একটি শত্রুজগত।'

খ্রিস্টানরাও কোনো একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। আর ইহুদিরা এক্ষেত্রে বেশি বিচলিত। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৭ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের আগে ইহুদিরা দু'আ করত, হে খোদা, এ-বছরটি আমাদেরকে জেরুজালেমে থাকতে দাও। আর এখন তারা প্রার্থনা করছে, হে খোদা, আমাদের মাসীহ যেন শীঘ্র এসে পড়েন।

মোটকথা, যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ইহুদিরা সেগুলোকে দাজ্জালের জন্য প্রমাণ করতে চায়। এক্ষেত্রে তারা খ্রিস্টানদেরকেও ধোঁকা দিচ্ছে যে, আমরা প্রতিশ্রুত মাসীহর অপেক্ষা করছি আর মুসলমানরা হলো মাসীহ'র বিরোধী। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। মুসলমান ও খ্রিস্টান ঈসা ইবনে মারয়াম-এর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। পক্ষান্তরে ইহুদিরা যার অপেক্ষা করছে, সে হলো দাজ্জাল, ঈসা ইবনে মারয়াম যাকে হত্যা করবেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের উচিত ছিল মুসলমানদের সঙ্গ দেওয়া – ইহুদিদের নয়। কেননা, ইহুদিরা তাদের পুরনো শত্রু।

নবুওতের দাবিদার মিথ্যাবাদী বুশ

এখানে আমি ঈমানদারদের খেদমতে আল্লাহর শত্রুদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, যে-যুদ্ধটিকে তারা কোনোই গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং যাকে 'রাজনীতি' নাম দিয়ে নিজের আঁচল বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কাফেরবিশ্ব সেই যুদ্ধটিকে কোন চোখে দেখছে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ইরাক আক্রমণের আগে বলেছিলেন, এই যুদ্ধের পর তাদের প্রতিশ্রুত মাসীহ (অর্থাৎ দাজ্জাল) আবির্ভূত হবেন। এরপর বুশ ইসরাইল সফর করেন। মস্কো টাইম্‌স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই সফরের সময় এক বৈঠকে – যেখানে ফিলিস্তিনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাস ও হামাস নেতাও উপস্থিত ছিলেন – বলেছেন, 'বর্তমান পদক্ষেপে আমি সরাসরি খোদা থেকে শক্তি অর্জন করেছি। খোদা আমাকে আদেশ করেছেন, আলকায়েদার উপর আঘাত হানো। সেজন্য আমি তার উপর আঘাত হেনেছি। তারপর তিনি আদেশ করেছেন, সাদ্দামের উপর আক্রমণ করো। ফলে আমি সাদ্দামের উপর আক্রমণ চালিয়েছি। এখন আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হলো, আমি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার সমাধান করব। তোমরা (ইহুদিরা) যদি আমাকে সহায়তা দাও, তাহলে আমি সম্মুখে অগ্রসর হব। অন্যথায় আমি আসন্ন নির্বাচনের প্রতি মনোযোগী হতে চাই।'

বুশের এই বক্তব্য প্রতিজন সেই ঈমানদারের চোখগুলোকে খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যারা বিশ্বময় চলমান জিহাদগুলোকে বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করে বদনাম করছে কিংবা নিজেকে সেগুলো থেকে সম্পর্কহীন করে রেখেছে।

বুশ প্রায়ই নিজেকে নবী বলে দাবি করে থাকেন। তিনি বলেন, 'আই এম ম্যাসেঞ্জার অফ গড' – আমি খোদার পয়গম্বর। বুশের খোদা ইবলিস বা দাজ্জাল, যে তাকে সরাসরি আদেশ-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে আদেশ করে থাকে।' আর বুশ এ-যুগে জগতের সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।

'ফ্রি থট টুডে'-এর সম্পাদকের মত, 'প্রেসিডেন্ট বুশের মতো ধর্মীয় প্রেসিডেন্ট আমি এর আগে কখনও দেখিনি। তিনি একটি ধর্মীয় মিশন নিয়ে কাজ করছেন। আপনি ধর্মকে তার সমরনীতি থেকে পৃথক করতে পারবেন না।'

বুশের সমালোচকরা যখন প্রশ্ন তুলল, এই যুদ্ধে আপনি খোদাকে টেনে এনেছেন কেন? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদের এই যুদ্ধে খোদা নিরপেক্ষ নন।'

ডেভিড ফ্রম তার 'দি রাইন ম্যান' নামক বইতে লিখেছেন, 'এই যুদ্ধ বুশকে একজন পাকা ক্রুসেডার বানিয়ে দিয়েছে।'

বুশের এই অবস্থা ১১ সেপ্টেম্বরের কর্মফল নয়। বরং আগে থেকেই তিনি একজন ধর্ম-উন্মাদ। তিনি যখন টেকসাসের গভর্নর ছিলেন, তখন বলেছিলেন, 'আমি যদি ভাগ্যলিপির উপর – যা সকল মানবীয় পরিকল্পনাকেও একধারে সরিয়ে দেয় – বিশ্বাস না রাখতাম, তাহলে আমি কোনোদিনও গভর্নর হতে পারতাম না।'

বুশকে নিয়ে যারা লিখেছেন, তাদের মন্তব্য হলো, তার প্রতিটি বক্তব্য ও প্রতিটি সাক্ষাৎকার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তিনি মনে করছেন, তিনি একটি 'ম্যাসিনিক মিশন' (দাজ্জালি মিশন) নিয়ে কাজ করছেন। বলা বাহুল্য যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষা করছে আর ইহুদিরা ঈসার পরিবর্তে মাসীহ-এর তথা দাজ্জালের অপেক্ষা করছে। সেজন্য বুশও ইহুদিদের নিমকের হক আদায় করণার্থে 'আমি ঈসায়ী মিশনের উপর প্রতিষ্ঠিত' বলার পরিবর্তে বলছেন 'আমি মসীহর মিশনের উপর প্রতিষ্ঠিত'। শব্দের এহেন হেরফের করে বুশ সকল খ্রিস্টানকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

দাজ্জালের ফেতনা হাদীছের আলোকে

দাজ্জালের ফেতনা কতটা ভয়াবহ একটি বিষয় দ্বারাই তার অনুমান করা যায় যে, স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি যখন সাহাবাগণের সম্মুখে এই ফেতনার আলোচনা করতেন, তখন তাদের মুখে ভয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেত। প্রশ্ন হলো, দাজ্জালের ফেতনায় সেই বিষয়টি কোনটি, যেটি সাহাবা কিরামকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল? সেটি কি ভয়াবহ যুদ্ধ, নাকি মৃত্যু? কিন্তু সাহাবা কিরাম (রাযি.) তো এ-বিষয়গুলোকে ভয় পাওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। সেই বিষয়টি হলো, দাজ্জালের ধোঁকা ও প্রতারণা যে, সে সময়টি এত ভয়াবহ হবে যে, বাস্তব অবস্থাটা আসলে কী তা বোঝা-ই সম্ভব হবে না। মানুষকে বিভ্রান্তকারী, নেতার ছড়াছড়ি থাকবে। অপপ্রচারের অবস্থা এই হবে যে, মুহূর্তমধ্যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে পৃথিবীর কোনায়-কোনায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। মানবতার শত্রুকে মুক্তিদাতা আর মুক্তিদাতাকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হবে।

এ-কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফেতনাকে খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। তার গঠন, আকৃতি ও আত্মপ্রকাশের স্থান পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সাধারণ মানুষ তো বটে; বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই ফেতনার আলোচনা একদম ছেড়ে দিয়েছে। অথচ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই ফেতনার আলোচনা করে বলেছেন, আমি বিষয়টি তোমাদেরকে বারবার এইজন্য বর্ণনা করছি, যাতে তোমরা বিষয়টি ভুলে না যাও। তোমরা বিষয়টি উপলব্ধি করো, তাতে চিন্তা-গবেষণা করো এবং অন্যদের কানে পৌঁছিয়ে দাও।

দাজ্জালের আগে পৃথিবীর অবস্থা

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِيْنَ خَدَاعَةٌ يُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الْأَمِيْنُ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ مِنَ النَّاسِ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِيْ أَمْرِ الْعَامَّةِ

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের কয়েকটি বছর হবে প্রতারণার বছর। এ-সময়টিতে সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আর মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা হবে। দুর্নীতিবাজকে আমানতদার আর আমানতদারকে দুর্নীতিবাজ মনে করা হবে। আর মানুষের মধ্যে থেকে 'রুআইবিজা'রা কথা বলবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'রুআইবিজা' কী জিনিস? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অপরাধপ্রবণ লোকেরা জনসাধারণের বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলবে।'[১]

হাদীছটি বর্তমান যুগের জন্য কতখানি উপযোগী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাকথিত 'সভ্যজগত'-এর বিবৃত মিথ্যাকে কত 'শিক্ষিত' মানুষও সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সেই মিথ্যার ফিরিস্তি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, যদি তা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে লেখকের জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু মিথ্যার তালিকা শেষ হবে না। আর কত সত্য এমন আছে, যার গায়ে 'ইনসাফপ্রিয়' পশ্চিমা মিডিয়া তাদের প্রতারণার এমন কলঙ্ক লেপে দিয়েছে যে, জীবন ক্ষয় করে পরিষ্কার করলেও তা বিমোচিত হবে না।

এই হাদীছে একটি শব্দ আছে 'খাদাআ'। শব্দটির একটি অর্থ বৃষ্টি বেশি হওয়া। ইবনে মাজার ব্যাখ্যায় এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 'এই বছরগুলোতে বৃষ্টি

---

১. *মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীছ নং ১৩৩২; মুসনাদে আবী ইয়া'লা ॥ হাদীছ নং ৩৭১৫; আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান*

বেশি হবে; কিন্তু ফসলের উৎপাদন কম হবে। এই বছরগুলোর জন্য এটি হলো একটি ধোঁকা।'

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ النَّاسُ فِيْ فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ إِيْمَانٍ لا نِفَاقَ فِيْهِ فُسْطَاطُ نِفَاقٍ لا إِيْمَانَ فِيْهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوْا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ

উমাইর ইবনে হানী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দুটি তাঁবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি তাঁবু হবে ঈমানের, যেখানে কোনো নিফাক (কপটতা) থাকবে না। অপর তাঁবুটি হবে নিফাকের, যেখানে কোনো ঈমান থাকবে না। যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, তখন সেদিন থেকে বা তার পরদিন থেকে দাজ্জালের অপেক্ষা করো।'[২]

আল্লাহপাকের হেকমত অনেক সূক্ষ্ম। তিনি যাকে দ্বারা ইচ্ছা হয় কাজ নিয়ে নেন। মুসলমানরা নিজেরা তো এই উভয় (মুমিনওয়ালা ও মুনাফিকওয়ালা) তাঁবু তৈরি করে নিতে পারে না। তাই আল্লাহ এক কাফের নেতার মাধ্যমে কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। ইহুদি মতাদর্শের সেবক সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা করেছিলেন, কে আমাদের তাঁবুতে আর কে ঈমানওয়ালাদের তাঁবুতে থাকতে চাও?

বিপুলসংখ্যক মানুষ এই দুই তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। আল্লাহর এই কাজটিও পরিপূর্ণ করে দেবেন এবং অবশ্যই করবেন। তাতে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে, কে ঈমানওয়ালা আর কার অন্তরে ঈমানওয়ালাদের তুলনায় আল্লাহর শত্রুদের প্রতি বেশি ভালবাসা লুকিয়ে আছে। তাই প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার যে, আমি কোন তাঁবুতে আছি কিংবা আমার সফর কোন তাঁবুর দিকে। নীরব দর্শণার্থীদের না ইবলিস ও তার দলভুক্তদের প্রয়োজন আছে, না আল্লাহর তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে। এই যুদ্ধ সিদ্ধান্তমূলক লড়াই। কাজেই প্রত্যেককে কোনো-না-কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে।

এটি এমন একটি সময়, যখন প্রতিজন ব্যক্তি, প্রতিটি সংগঠন, প্রতিটি দল সেদিকে ঝুঁকে যাবে, যার সঙ্গে তার হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা থাকবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ

২. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯৪; মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৩

'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি ভেবে বসেছে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না?'[৩]

প্রতিটি দেশ ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত ইহুদি স্বার্থের অনুকূলে একাট্টা হয়ে যাবে এবং বহু সংগঠন একটি অপরটির সঙ্গে মিশে যাবে। যেসব সংগঠনের বাগডোর ইহুদিদের হাতে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইহুদি মিশন বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ইহুদি ধর্মনেতাদের মুখ থেকে যে-আওয়াজ উত্থিত হবে, উক্ত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকেও একই ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِي الْحَطِيْمِ مَعَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا ثُمَّ قَالَ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً وَلَيَكُوْنَنَّ أَئِمَّةٌ مُضِلُّوْنَ وَلَيَخْرُجَنَّ عَلَى أَثْرِ ذَالِكَ الدَّجَّالُوْنَ الثَّلاثَةُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَدْ سَمِعْتَ هٰذَا الَّذِيْ تَقُوْلُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَّهُوْدِيَّةِ أَصْفَهَانَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একদিন আমি হুযায়ফার সঙ্গে হাতীমে ছিলাম। সে-সময় তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। পরে বললেন, ইসলামের আংটাগুলো একটি-একটি করে ভেঙে যাবে আর বহু বিভ্রান্তকারী নেতার আবির্ভাব ঘটবে। তার পরপরই তিনজন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ, এই কথাগুলো আপনি আল্লাহর রাসূর থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এই কথাগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি। আর আমি তাঁকে একথাও বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল ইস্‌ফাহানের ইহুদিয়া নামক অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।[৪]

এই বর্ণনাটি অনেক দীর্ঘ, যার অংশবিশেষ এই– তিনটি আর্তনাদ উত্থিত হবে, যা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সবাই শুনতে পারে...। হে আবদুল্লাহ, যখন তুমি দাজ্জালের সংবাদ শুনবে, তখন পালিয়ে যেয়ো।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমি হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যাদেরকে পেছনে রেখে যাব, তাদের হেফাজত কীভাবে করব? হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, তাদেরকে আদেশ করে যাবেন, যেন তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়। হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা যদি সবকিছু ত্যাগ করে যেতে না পারে? বললেন, তাদেরকে আদেশ করে যাবেন, যেন তারা সব সময় ঘরেই থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, যদি

৩. সূরা মুহাম্মাদ ॥ আয়াত : ২৯

৪. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৭৩

তারা এ-ও করতে না পারে, তাহলে? হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, হে ইবনে ওমর! সময়টি হবে আতঙ্ক, ফেতনা, অনাচার ও লুটপাটের। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লহ (হুযায়ফা), সেই দুর্যোগ থেকে কোনো মুক্তি আছে কি? হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, কেন থাকবে না? এমন কোনো ফেতনা নেই, যার থেকে মুক্তি নেই।

অপর এক হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের ব্যাপারে দাজ্জাল ছাড়া আরও যে-ফেতনাটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো বিভ্রান্তকারী নেতৃবর্গ।

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি যে-বিষয়টিকে বেশি ভয় করি, তা হলো, বিভ্রান্তকারী নেতৃবর্গ।'

দাজ্জালের সময় এই চরিত্রের নেতাদের ছড়াছড়ি থাকবে। দাজ্জালি শক্তির চাপ কিংবা প্রলোভনে এসে তারা নিজেরাও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অনুগত-অনুসারীদেরও সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ হবে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমার ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। সে-সময় তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'তার আগে তিনটি বছর অতিবাহিত হবে। প্রথম বছরটিতে আকাশ এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি এক-তৃতীয়াংশ ফসল ধরে রাখবে। দ্বিতীয় বছর আকাশ দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি দুই-তৃতীয়াংশ ফসল ধরে রাখবে। তৃতীয় বছর আকাশ সম্পূর্ণ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি তার পূর্ণ ফসল ধরে রাখবে। ফলে সব ধরনের গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৫]

মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই-এর বর্ণনায় আছে :

تَرَى السَّمَاءَ تُمْطِرُ وَهِيَ لَا تُمْطِرُ وَتَرَى الْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِيَ لَا تُنْبِتُ

'তুমি আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে দেখবে; অথচ সে বৃষ্টি বর্ষণ করবে না। তুমি জমিনকে ফসল উৎপন্ন করতে দেখবে; অথচ জমি ফসল উৎপন্ন করবে না।'[৬]

এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, বৃষ্টিও বর্ষিত হবে, ফসলও উৎপন্ন হবে। কিন্তু তথাপি মানুষের কোনো উপকার হবে না এবং মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে যাবে। এই আধুনিক যুগে এর অনেক পদ্ধতি হতে পারে। সমগ্র বিশ্বের কৃষিকর্মকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নেওয়ার যেসব পলিসি ইহুদি মস্তিষ্ক গ্রহণ করেছে, তার

৫. আল-মু'জামুল কাবীর ॥ হাদীছ নং ৪০৬; মুসনাদে আহমাদ
৬. মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৯

প্রতিক্রিয়া এখন আমাদের দেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

দাজ্জালের গঠন-আকৃতি

أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَه' الْأَعْوَرَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছে। দাজ্জাল কানা-ই হবে। আর তোমাদের রব অবশ্যই কানা নন। আর দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে 'কাফিরুন'।[৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে, যেন সেটি ফুলে থাকা আঙুর।'[৮]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَه' جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُه' جَنَّةٌ وَجَنَّتُه' نَارٌ

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের বাঁ চোখ কানা হবে। মাথার চুলগুলো হবে ঘন ও এলোমেলো। তার সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। কিন্তু মূলত তার জাহান্নাম হলো জান্নাত আর জান্নাত হলো জাহান্নাম।[৯]

দাজ্জালের চুল সম্পর্কে ফাত্হুল বারীতে আছে :

كَأَنَّ رَأْسَه' أَغْصَانُ شَجَرَةٍ

'তাঁর মাথাটা যেন কোনো গাছের কতগুলো ডাল।'

অর্থাৎ– চুল পরিমাণে বেশি ও এলোমেলো হওয়ার কারণে মাথাটিকে গাছের ডাল-পালার মতো মনে হবে।

৭. সহীহ বুখারী ॥ হাদীছ নং ৬৫৯৮
৮. সহীহ বুখারী ॥ হাদীছ নং ৬৫৯০
৯. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৪৮

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, 'দাজ্জালের একটি চোখ বসানো থাকবে। অপর চোখে মোটা দানা থাকবে। তার দুই চোখের মাঝে 'কাফিরুন' লিখা থাকবে, যেটি লেখাপড়া জানা-নাজানা সব মুমিন পড়তে পারবে।'[১০]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় একথাও আছে যে, তার সঙ্গে দুজন ফেরেশতা থাকবে। তারা দুজন নবীর আকারে তার হাতে থাকবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি চাইলে উক্ত দুই নবী ও তাদের পিতাদেরও নাম বলতে পারব। তাদের একজন দাজ্জালের ডান দিকে, একজন বাঁ দিকে থাকবে। এটি হবে পরীক্ষা। দাজ্জাল বলবে, আমি তোমাদের রব নই কি? আমি কি মৃতকে জীবিত করতে পারি না? আমি কি মৃত্যু দিতে পারি না? উত্তরে এক ফেরেশতা বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ। তার এই উক্তি দ্বিতীয় ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। ফলে দ্বিতীয় ফেরেশতা তার উত্তরে বলবে, তুমি ঠিকই বলেছ। দ্বিতীয় ফেরেশতার এই উক্তি সবাই শুনতে পাবে এবং ধরে নেবে, এই ফেরেশতা দাজ্জালকে সত্যায়ন করছে। এটিও হবে একটি পরীক্ষা।

দাজ্জাল সুনির্দিষ্ট এক ব্যক্তি হবে। কারণ, হাদীছে সুস্পষ্টভাবে এ-বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কোনো রাষ্ট্রকে দাজ্জাল মনে করা ঠিক নয়। যেমনটি খাওয়ারেজ ও জাহ্মিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহ মনে করে থাকে। কাজী ইয়ায (রহ.) বলেছেন, 'ইমাম মুসলিম প্রমুখ দাজ্জালের কাহিনীতে এই যে-হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, এগুলো প্রমাণ করছে, দাজ্জালের অস্তিত্ব যথার্থ এবং সে সুনির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি হবে।'[১১]

দাজ্জালের উভয় চোখ ত্রুটিপূর্ণ হবে

দাজ্জালের চোখ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা এসেছে। কোথাও তার ডান চোখ কানা বলা হয়েছে। কোথাও বাম চোখ। এ-বিষয়ে মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উছমানি সাহেব 'আলামাতে কেয়ামাত ওয়া নুযূলে মাসীহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'সারকথা হলো, দাজ্জালের দুটো চোখই ত্রুটিপূর্ণ হবে। বাঁয়েরটি একদম জ্যোতিহীন ও মোছানো আর ডানেরটি কোঠর থেকে বের হওয়া থাকবে আঙুরের মতো।'

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) 'তাফিয়া'র ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, দাজ্জালের ডান চোখটি বাইরে বের হওয়া থাকবে।'[১২]

বর্তমান যুগে বিভিন্ন বড়-বড় কোম্পানির লোগোতে আপনি একটি চোখ দেখতে পাবেন। কোথাও চোখটি শাদা, যেন চমকানো তারকা। আবার কোথাও চোখটির রং সবুজ দেখানো হয়, যেন সবুজ সিসা।

১০. *মিশকাত শরীফ ‖ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : হাদীছ নং ৫২৩৭*
১১. *মুসনাদে আহমাদ ‖ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২১*
১২. *ফাতহুল বারী ‖ খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২৫*

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَيْنُهُ خَضْرَاءُ كَالزُّجَاجَةِ

'দাজ্জালের চোখ সিসার মতো সবুজ হবে।'[১৩]

এটি কি নিছক কাকতালীয় ঘটনা যে, এই কোম্পানিগুলো একটি ত্রুটিপূর্ণ চোখকে তাদের কোম্পানির মনোগ্রাম হিসেবে বেছে নিয়েছে? নাকি বুঝে-শুনে এখন থেকেই তারা জনগণকে এই ত্রুটিপূর্ণ চোখটির সঙ্গে পরিচিত করে তুলছে?

আলোচ্য হাদীছে আছে, দাজ্জালের কপালে 'কাফিরুন' লিখা থাকবে। এখানে কথাটির প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো কোম্পানির নাম কিংবা কোনো রাষ্ট্রের পতাকা।

ইমাম নববি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, বিজ্ঞ আলেমগণের মতে সঠিক হলো, উল্লেখিত লিখাটি বাস্তব। আল্লাহপাক একে দাজ্জালের মিথ্যাবাদী হওয়ার অকাট্য চিহ্ন হিসেবে স্থির করেছেন।

প্রতিজন মুমিন এই লেখাটি পড়তে পারবে। প্রশ্ন জাগে, সবাই যখন পড়তে পারবে, তখন মানুষ তার ফেতনায় আক্রান্ত হবে কেন?

এই প্রশ্নের এক উত্তর হলো সেই হাদীছ, যাতে বলা হয়েছে, পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও বহু মানুষ আপন জাগতিক স্বার্থের খাতিরে দাজ্জালের সঙ্গ দেবে।

আরেকটি উত্তর এই হতে পারে যে, পড়তে পারা আর লেখার মর্ম বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করা এক কথা নয়। বর্তমান যুগেও বহু মুসলমান এমন আছে, যারা কুরআনের বিধানাবলি পড়ে; কিন্তু সে মোতাবেক আমল করে না। জানে; কিন্তু মানে না। সবাই জানে, সুদি ব্যবস্থা খোলাখুলি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু বহু মানুষ কার্যত সুদের সঙ্গে জড়িত।

দাজ্জালের যুগেও বহু মানুষ ডলার ও জাগতিক সৌন্দর্যের বিনিময়ে নিজের ঈমান বিক্রি করে ফেলবে। তারা ঈমান পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে বরণ করে নেবে। কাজেই যারা আল্লাহর নামে জীবন বিলানোর পরিবর্তে দাজ্জালের সম্মুখে মাথানত করে ফেলবে, তারা দাজ্জালের কপালের 'কাফিরুন' লিখাটি দেখতে পাবে না। বরং তাকে তারা 'যুগের মাসীহ' ও 'মানবতার মুক্তির সনদ' আখ্যা দেবে এবং এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে বেড়াবে। যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদেরকে তারা বিভ্রান্ত বলবে। তারপরও নিজেদের ব্যাপারে দাবি করবে, আমরা মুসলমান। অথচ ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক থাকবে না। এসব এইজন্য হবে যে, বদ-আমল ও আত্মিক ব্যাধির কারণে তাদের ঈমানি শক্তি রহিত হয়ে যাবে।

১৩. *মুসনাদে আহমাদ ‖ হাদীছ নং ২১১৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ‖ হাদীছ নং ৬৭৯৫*

এই উত্তর আমি নিজের পক্ষ থেকে দিচ্ছি না। এটি আমার মনগড়া কথা নয়। বরং বুখারী শরীফের ব্যাখ্যকার হাফিজ ইবনে হাজ্‌র আসকালানি ও মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি (রহ.) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজ্‌র (রহ.) ফাত্‌হুল বারীতে লিখেছেন :

فَيَخْلُقُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِ الْإِدْرَاكَ دُوْنَ تَعَلُّمٍ

'সেদিন আল্লাহ লেখাপড়া জানা ব্যতিরেকেই মুমিনদের জন্য বুঝ তৈরি করে দেবেন।'

ইমাম নববি লিখেছেন :

فَيُظْهِرُ اللهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهَا وَيُخْفِيْهَا عَلٰى مَنْ اَرَادَ شَقَاوَتَه'

'সেদিন আল্লাহ মুমিনদের জন্য উক্ত লেখাটি প্রকাশ করে দেবেন আর বদকার লোকদের জন্য গোপন করে রাখবেন।'

দাজ্জালের ফেতনা অনেক বিস্তৃত হবে

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের মজলিসে যখনই দাজ্জালের আলোচনা করতেন, তখনই তাঁদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে যেত এবং তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কিন্তু এর কারণ কী যে, আজ মুসলমান এ-ব্যাপারে কোনোই চিন্তা করছে না?

সম্ভবত তার কারণ হলো, আজ মানুষ এই ফেতনাটিকে সেই অর্থে বুঝবার চেষ্টা করছে না, যে-অর্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন। আজ যদি কোনো মুসলমান এই হাদীছটি শোনে, দাজ্জালের কাছে খাদ্যের পাহাড় ও পানির নহর থাকবে, তখন সে হাদীছটি এমন অবস্থায় শোনে যে, তার পেট পরিপূর্ণ থাকে এবং পানির কোনোই অভাব থাকে না। ফলে সে দাজ্জালের সময়কার পরিস্থিতিকেও নিজের ভরা পেট ও ভেজা গলার সময়কার অবস্থারই উপর অনুমান করে। এই হাদীছগুলো শুনবার সময় তার চোখের সামনে এ-দৃশ্যটি মোটেও ভাসে না যে, তখনকার পরিস্থিতি এমন হবে যে, দিনের-পর-দিন নয়, সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ কেটে যাবে, রুটির একটি টুকরোও জুটবে হবে। অনাহার মানুষকে কাহিল করে তুলবে। পানির অভাবে কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিঁধবে।

আপনি বাইরে থেকে ফিরে যখন ঘরে পা রাখবেন, তখন দেখতে পাবেন, আপনার কলিজার টুকরো যে-সন্তানটির একটি মাত্র ইঙ্গিতে তার প্রতিটি বাসনা ও দাবি পূরণ হয়ে যেত, আজ তীব্র পিপাসায় তার জিহ্বাটা বের হয়ে গেছে। কয়েক দিনের অনাহার তার গোলাপের মতো সুন্দর মুখ থেকে জীবনের সব সৌন্দর্য-ঔজ্জ্বল্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দৃশ্যটি দেখামাত্র আপনার অন্তর খাঁ-খাঁ করে উঠল। কিন্তু আপনি অসহায়, অক্ষম। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সন্তানের দিক থেকে

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সেদিকে তাকালেন, ওদিকে পড়ে আছে আক্ষেপ ও যন্ত্রণার আরেকখানি প্রতিচ্ছবি – মা – আম্মাজান, হ্যাঁ, আপনার আম্মাজান! সেই মা, যিনি আপনাকে ক্ষুধার্তপেটে কখনও ঘুমোতে দেননি। যিনি আপনার ইঙ্গিতেই আপনার পিপাসার কথা বুঝে ফেলতেন। যিনি নিজের সমস্ত সুখ-আহ্লাদকে আপনার জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন।

আজ আপনার সেই মা চোখের দৃষ্টিতে হাজারো প্রশ্ন ভরে নিয়ে যুবক পুত্রের পানে তাকিয়ে আছেন এই আশায় যে, বাছা আমার আজ এক টুকরো রুটি কোথাও থেকে নিয়ে এসেছে। মায়ের মমতার খাতিরে পুত্র আজ কোথাও থেকে এক কাতরা পানি সংগ্রহ করে এনেছে। কিন্তু পুত্রের মুখের লেখা পড়তে সক্ষম মা আপনার মুখাবয়বে লেখা জবাবটা পড়ে নিলেন। পুত্রের অসহায়ত্বের ফলে মায়ের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আপনার কলিজাটা মুখে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হলো। আপনি ভেতরে-ভেতরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগলেন।

কষ্টটা সহ্য করতে না পেরে এবার আপনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এই আশায় যে, সম্ভবত ওদিকে কেউ নেই। কিন্তু না, আছে। ওখানেও একজন পড়ে আছে – আপনার জীবন-সফরের সঙ্গিনী, পরীক্ষার প্রতিটি মুহূর্তে যে আপনাকে সাহস জুগিয়েছে। কিন্তু আজ ঠোঁটদুটো তার শুকনো। আত্মনিয়ন্ত্রণের সমুদ্র ভেতরে-ভেতরেই ঢেউ খেলছে। আপনার জীবন-আকাশের চাঁদটির গায়ে দৃষ্টি নিপতিত হওয়ামাত্র হঠাৎ আপনার অন্তর্জগতে লুকিয়ে থাকা অশ্রুর সমুদ্রে ঝড় শুরু হয়ে গেল আর দেখতে-না-দেখতেই আপনার প্রেম আপনারই অশ্রুতাপে গলে যেতে শুরু করল। অবশেষে – আপনিও তো মানুষ। আপনার বুকেও তো গোশতপিন্ডই ধুক্‌ধুক্‌ করে। কতক্ষণ আর নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন! যখন সবগুলো জাগতিক অবলম্বন ভেঙে গেল, আশার সব কটি প্রদীপ নিভে গেল, এবার আপনার চোখদুটোও গণ্ডদেশকে ভিজিয়ে দিতে শুরু করল। সন্তানের স্নেহ, মায়ের মমতা ও স্ত্রীর প্রেম সবাই মিলে আপনার হৃদয়টাকে তামার মতো গলিয়ে দিল। কোথাও কোনো আশ্রয় নেই, কোথাও কোনো সহায়-সহযোগিতা নেই। কেউ নেই আপনার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবার। কীভাবে থাকবে! প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি দরজায় এই একই দৃশ্য!

কেউ নেই সাহায্য করবার – সকলেরই সাহায্য দরকার!

এমন সময় বাইরে থেকে সুস্বাদু খাবারের সুঘ্রাণ আর পানির কলকল শব্দ কানে ভেসে এল। আপনি ও আপনার পরিজন সবাই দৌড়ে বাইরে গেলেন। মনে হলো, কষ্টের দিন বুঝি শেষ হয়ে গেছে। মানুষের এই বনে কোনো 'মাসীহা' এসে পড়েছেন। আগত 'মাসীহা' ঘোষণা করছে, 'ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর লোকেরা! এই সুঘ্রাণযুক্ত সুস্বাদু খাবার, এই ঠাণ্ডা পানি তোমাদেরই জন্য।'

ঘোষণাটি শোনামাত্র আপনার, আপনার পরিজন ও নগরীর অন্যান্য বাসিন্দাদের আধা জীবন যেন এমনিতেই ফিরে এসেছে। মাসীহা আবার বলতে শুরু করল, এই সবকিছু তোমাদেরই জন্য। কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, এই খাবার-পানির মালিক আমি? তোমরা কি এই বাস্তবতাকে স্বীকার করছ যে, এসব বস্তুসামগ্রী আমার অধীনে?

এই দ্বিতীয় ঘোষণাটি শোনার পর খাবার-পানির প্রতি অগ্রসরমান আপনার পা কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল। আপনি কিছু ভাবতে শুরু করলেন। আপনার স্মৃতি বলল, এই শব্দগুলো তো চেনাচেনা মনে হচ্ছে। আপনার মনে পড়ে গেল, এই 'মাসীহা'টা কে। কিন্তু – কিন্তু সেই মুহূর্তে পেছন থেকে আপনার সন্তানের কান্নার শব্দ তীব্র হতে লাগল। মায়ের আর্তনাদ কানে এসে বাজল। স্ত্রীর করুণ আহাজারি কানে এসে ঢুকল। আপনি ছুটে গেলেন। আপনার কলিজার টুকরা – আপনার সন্তানটি মৃত্যু ও জীবনের মাঝে ঝুলছে। যদি কয়েক ফোঁটা পানি জুটে যায়, তাহলে শিশুটির জীবনটা বেঁচে যেতে পারে।

এখন একদিকে আপনার সন্তান, মা ও স্ত্রীর ভালবাসা, অপরদিকে একটি প্রশ্নের উত্তর।

একদিকে আনন্দপূর্ণ ঘর, অন্যদিকে বিলাপের আসর।

যেন একদিকে আগুন, একদিকে মনমাতানো ফুলবাগান।

বলুন, বিবেকের বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিয়ে ভাবুন, বিষয়টি কি এতই সহজ, যতটা আপনি মনে করছেন? বোধহয়, না। বরং তখনকার পরিস্থিতি হবে মানবেতিহাসের সবচে ভয়াবহ ফেতনা!

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الدَّجَّالِ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'আদমের সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে আল্লাহর নিকট দাজ্জাল অপেক্ষা বড় ফেতনা দ্বিতীয়টি নেই।'[১৪]

মুসলিম শরীফে আছে :

مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الدَّجَّالِ

'আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে দাজ্জাল অপেক্ষা জঘন্য সৃষ্টি দ্বিতীয়টি আর নেই।'[১৫]

---

১৪. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৭৩
১৫. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৬৬

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন (নামাযে) তাশাহ্‌হুদ পাঠ করবে, তখন যেন সে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলবে, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা ও দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৬]

দেখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করার জন্য কত চিন্তা করতেন যে, আমাদেরকে নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُه‘ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءٌ وَنَارٌ فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَي النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ أَنَّه‘ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرٰى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّه‘ عَذْبٌ بَارِدٌ

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল যখন বের হবে, তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু মানুষ যাকে আগুন বলে দেখবে, সেটিই হবে শীতল পানি। আর যাকে পানি বলে দেখবে, সেটিই হবে ভস্মকারী আগুন। অতএব তোমাদের কেউ যদি দাজ্জালকে পায়, সে যেন সেই বস্তুটিতে অবতরণ করে, যাকে সে আগুন বলে দেখবে। কেননা, সেটিই হলো সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি।'[১৭]

অপর এক হাদীসে দাজ্জালের সঙ্গে রুটি ও গোশতের পাহাড় থাকবে বলে উল্লেখ রয়েছে। তার অর্থ হলো, যেলোক তার সম্মুখে মাথানত করবে, তার কাছে সম্পদ ও খাদ্যপণ্যের সমারোহ থাকবে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি তাকে অমান্য করবে, তার উপর সব ধরনের অবরোধ আরোপ করে তার জীবনকে কোণঠাসা ও সংকটাপন্ন করে ফেলবে – যেমনটি আমরা বলেছি যে, দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে তার ফেতনা শুরু হয়ে যাবে। যেমনটি বর্তমানে আফগানিস্তান-ইরাকের উপর দাজ্জালি শক্তির অগ্নিবৃষ্টি চলছে। অপর দিকে যারা দাজ্জালি শক্তিগুলোর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের জীবনে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে।

---

১৬. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১২
১৭. সহীহ বুখারী ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৭২

পানি নিয়ে যুদ্ধ ও দাজ্জাল

সম্ভবত এখনও মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে না যে, দাজ্জাল পানি নিয়ে যুদ্ধ করবে কেন। পানি তো সব জায়গাই পাওয়া যায়। বিষয়টি বুঝতে হলে বর্তমান পৃথিবীতে পানির বাস্তবতা বুঝতে হবে। পৃথিবীতে সুপেয় পানির দুটি বড় ভাণ্ডার আছে। একটি হলো তুষারময় পর্বত। এই ভাণ্ডারের পানির পরিমাণ ২৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার। দ্বিতীয়টি পাতাল। এই ভাণ্ডারটির পানির পরিমাণ ৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার।

এভাবে পৃথিবীতে বিদ্যমান পানযোগ্য পানির বড় পরিমাণটি হলো বরফ, যা গলে পৃথিবীর বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভূ-গর্ভস্থ পানি তার তুলনায় কম। বরফের এই মজুদ এন্টার্টিকা ও গ্রিনল্যান্ডে বেশি। আর এই দুটি স্থানের উপর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকার নেই। বাকি থাকল ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুদ। এ-ক্ষেত্রেও দু-ধরনের অঞ্চল থাকে। একটি সমতল অঞ্চল, অপরটি পার্বত্য। সমতল এলাকায় শহরাঞ্চলে পানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কিছু নয়। কেননা, শহরাঞ্চলের পানির সমুদয় স্টক কোনো জলাধার কিংবা সরকারি টিউবওয়েল থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে আগত পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সেজন্য শহুরে মানুষ পানির জন্য পুরোপুরিভাবে সেখানকার প্রশাসনের দায়ভার ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

দাজ্জালের ফেতনা গ্রামের তুলনায় শহর এলাকায় বেশির কঠোর হবে এবং শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ নাগরিক উক্ত ফেতনার শিকার হয়ে যাবে। তবে পল্লী অঞ্চলের পানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যও দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করবে।

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে পানি নিয়ে যুদ্ধ হবে, এমন গুজব আপনি শুনে থাকবেন। জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের, ইরাকের সঙ্গে তুরস্কের এবং ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পানি নিয়ে বিরোধ-বিবাদ জীবন-মৃত্যুর সমান মর্যাদা রাখে।

ইহুদি ও হিন্দু এই উভয় জাতিরই চরিত্র হলো, তারা শুধু নিজেরা বেঁচেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রতিবেশীকে মেরেই তবে নিজেরা বাঁচার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। এ-কারণেই ভারতের মতো ইসরাইলও আগে-ভাগেই তাবরিয়া উপসাগরের গতি পুরোপুরি নিজের দিকে নিয়ে নিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করে পিপাসায় মারার চেষ্টা করছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

দাজ্জালি শক্তিগুলো যদি মুসলিম বিশ্বের উপর প্রবহমান নদী-সাগরগুলোর উপর ডেম তৈরি করে এবং সেই ডেমগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তা হলে তারা নদীগুলোর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে এই জগতটিকে মরুভূমিতে

পরিণত করে দিতে পারবে। নদী যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভূ-গর্ভস্থ পানি অনেক নিচে চলে যাবে। তারপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষের কাছে পানযোগ্য কোনো পানি থাকবে না। ফলে মানুষ ফোঁটা-ফোঁটা পানির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তিনের পানির অবস্থা আমরা সামনে আলোচনা করব। এখানে আমরা ইরাক, মিসর ও পাকিস্তানের পানি নিয়ে আলোচনা করছি।

ইরাক : ইরাকে বড় দুটি নদী প্রবহমান। দজলা ও ফোরাত। উভয়টি এসেছে তুরস্ক থেকে। তুরস্ক ফোরাত নদীর উপর আতাতুর্ক ড্যাম তৈরি করেছে, যেটি পৃথিবীর বড় ড্যামগুলোর একটি, যার পানি ধারণের স্থান ৮১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই ভাণ্ডারটি ভরতে হলে ফোরাত নদীকে বর্ষা মৌসুমে এক মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাতে ঢালতে হবে। তার অর্থ হলো, তুরস্ক তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফোরাত নদীর পানি এক মাস পর্যন্ত ইরাক যেতে দেবে না। আর ইসলাম প্রশ্নে তুরস্ক সরকারের বর্তমান অবস্থা সকলেরই চোখের সামনে। পরিস্থিতি বলছে, ভবিষ্যতে তাদের ঝোঁক আন্তর্জাতিক দাজ্জালি জোটের প্রতি ধাবিত হবে।

মিসর : মিসরের সবচেয়ে বড় নদীটি হলো নীলনদ। কিন্তু এটিরও উৎপত্তি আফ্রিকার ওগান্ডা সেন্ট্রালের ভিক্টোরিয়ার ঝিল। নীলনদের পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো রুয়ান্ডা নদী।

পাকিস্তান : পাকিস্তানের বেশিরভাগ নদী এসেছে ভারত থেকে। ভারত সেগুলোর উপর ড্যাম তৈরি করছে। চন্নাব নদীর উপর ভারত বাগলিহার ড্যাম তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে। অনুরূপ তারা নিলাম নদীর উপর কাশনগঙ্গা ড্যাম নির্মাণ করছে। এভাবে ভারত পাকিস্তানের পানির গতি রোধ করে আমাদের ভূখণ্ডটিকে মরুভূমিতে পরিণত করার এবং আমাদেরকে পিপাসায় মারার চেষ্টা করছে।

ঝরনার মিষ্টি পানি – নাকি নেস্‌লে মিনারেল ওয়াটার?

এখন প্রশ্ন থাকল, দাজ্জাল পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর অসংখ্য কূপ ও নালা কীভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে একটি বিষয় মস্তিষ্কে বসিয়ে নিতে হবে যে, দাজ্জালের ফেতনা পার্বত্য অঞ্চলে কম হবে এবং যেসব পাহাড় আধুনিক জাহেলি সভ্যতা থেকে পুরোপুরি পবিত্র হবে, দাজ্জালের ফেতনা ওখানে পৌঁছবে না। কাজেই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ পানির প্রশ্নে দুর্ভোগ পোহাবে কম। তবে তার অর্থ এই নয় যে, দাজ্জালি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে কোনো মেহনত চলছে না। বরং বর্তমানে তাদের সর্বশক্তি পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর পানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

আপনি ইতিহাসে পড়ে থাকবেন, এমনকি মরু ও পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে দেখেও থাকবেন যে, যেসব অঞ্চলে পানির প্রাকৃতিক ভাণ্ডার, যেমন– নদী, কূপ কিংবা বরফীয় নালা প্রবহমান আছে, সেসব অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠেছে। আগে মানুষ রাস্তা ও হাট-বাজার দেখে বসতি গড়ত না। মানুষ বসতি গড়ত পানির উপস্থিতি দেখে, যদিও স্থানটি হতো পাহাড়ের চূড়া। কিন্তু বর্তমান যুগে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতেও দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ সেসব এলাকায় বসতি গড়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যেখানে মানুষের ভিড়-ভাড় বেশি। এখন বসতি গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম প্রাধান্য বিষয় কুদরতি পানির ভাণ্ডার হয় না, বরং পানির জন্য মানুষ পানির সেই ট্যাংকগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যেগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থায়নে উক্ত অঞ্চলগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছে।

এই হলো চিন্তার সেই পরিবর্তন, যা আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র পাহাড়ি লোকদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। যাতে এরা সেই প্রাকৃতিক পানির ভাণ্ডারগুলোর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে, যার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। চিন্তার এই বিপ্লবের লক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমাদের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে যে-প্রচেষ্টা চলছে, পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে গেলে আপনি সেসব দেখতে পাবেন।

এ-সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দূর-দূরান্তের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে আধুনিক জাহেলি সভ্যতার ক্রিয়া পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর জন্য আন্তর্জাতিক ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ বরাদ্দ আছে, যা পর্যটন, উন্নয়ন, নারীশিক্ষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রসারের নামে প্রদান করা হয়। দূর-দূরান্তের পাহাড় অঞ্চলগুলোতে সড়ক ও বিদ্যুতের সরবরাহ আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বিশেষ নির্দেশনার অংশ হয়ে থাকে। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান কূপগুলোর পানির ব্যাপারে এই প্রোপাগাণ্ডা শুরু হয়ে গেছে যে, এই পানি পান করলে অসুখ হয়। এভাবে তারা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত লোকদেরকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত করে নেস্‌লের বোতলজাত পুরনো পানিতে অভ্যস্ত করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যার মালিকানা সবটুকুই ইহুদিদের।

২০০৩ সালকে টাটকা পানির আন্তর্জাতিক বছর ঠিক করা হয়েছিল। (আর তাদের দৃষ্টিতে টাটকা পানির সংজ্ঞা হলো সেই পানি, যা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে) এর অধীনে অত্যন্ত জোরে-শোরে প্রচারণা চলানো হয়েছিল যে, পৃথিবী থেকে পানযোগ্য পানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নেস্‌লে মিনারেল ওয়াটারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এই অপপ্রচারেরই ক্রিয়া।

বিস্মিত হতে হয় লেখাপড়া জানা সেই লোকদের বিবেকের জন্য, যারা পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কূপের পানি ত্যাগ করে ওখানেও

বোতলজাত বাসি পানি ব্যবহার করছেন। অথচ, কূপের পানি শুধু পানিই নয় – তাতে পেটের পীড়ার নিরাময়ও বিদ্যমান। এর উত্তরে বলা হয়, ডাক্তারগণ বলেছেন, কূপের পানি ক্ষতিকর। যখন জিজ্ঞেস করা হয়, কোন ডাক্তার বলেছেন? তখন উত্তর আসে, ডব্লিউএইচও'র ডাক্তার। এখন আমার মতো স্বল্পবিদ্যার মানুষ কী করে জানবে, ডব্লিউ.এইচ.ও কীসের সংক্ষেপ? 'ওয়ার্ল্ড হিব্রু অর্গানাইজেশন' (আন্তর্জাতিক ইহুদি সংগঠন) নাকি 'ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন' (আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা)। হায়, এই লোকগুলো যদি জানত ডব্লিউএইচও'র ডাক্তারগণ প্রত্যেক সেই বস্তুর ব্যাপারেই ঘোষণা প্রদান করে, যেগুলো ইহুদি পুঁজিপতিদের স্বার্থের অনুকূল!

উল্লিখিত আলোচনার সার হলো, বিশ্বের মিষ্টি পানির ভাণ্ডারগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন এনজিও স্বতন্ত্রভাবে নিয়োজিত আছে। তারা নানা অজুহাতে এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দাজ্জাল কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে?

عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِّنْ يَهُوْدِ أَصْفَهَانَ عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, 'ইস্‌ফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে। তাদের গায়ে সবুজ বর্ণের চাদর (বা জুব্বা) থাকবে।'[১৮]

যেমনটি পেছনে বলে এসেছি, ইসরাইলে বিশেষ এক ধরনের পোশাক তৈরির কাজ চলছে, যেগুলো তাদের ধর্মনেতারা দাজ্জালের আবির্ভাবের পর পরিধান করবে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করলেন। আমি তখন বসে-বসে কাঁদছিলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দাজ্জালের কথা মনে পড়ে গেছে। শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি সে আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে আত্মপ্রকাশ করে, তবুও তোমার আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা, তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কানা হবে আর

১৮. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৬৬*

তোমার রব কানা নন। সে ইস্‌ফাহানের ইহুদিয়া নামক অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।'[১৯]

হযরত আমর ইবনে হুরাইছ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জাল পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যেটি প্রাচ্যে অবস্থিত এবং যাকে খোরাসান বলা হয়। তার সঙ্গে অনেক দল মানুষ থাকবে। তাদের একটি দলের লোকদের চেহারা স্ফীত ঢালের মতো হবে।'[২০]

দাজ্জালের সঙ্গে এমন একদল মানুষ থাকবে, যাদের মুখমণ্ডল স্ফীত ঢালের মতো হবে। প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি তাদের মুখমণ্ডল এরূপ হবে? নাকি তারা কিছু পরিধান করে মুখগুলোকে এরূপ বানিয়ে রাখবে? কোনটি সঠিক আল্লাহই তা ভালো জানেন।

এই হাদীছে খোরাসানকে দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থল বলা হয়েছে। এর আগের বর্ণনায় বলা হয়েছে ইস্‌ফাহান। এই দুই বর্ণনায় মূলত কোনো বিরোধ নেই। কারণ, ইস্‌ফাহান ইরানের একটি প্রদেশ আর ইরান একসময় খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খোরাসান সম্পর্কে সেই বাহিনীটির বর্ণনা পেছনে বিগত হয়েছে, যারা হযরত মাহ্‌দির সহায়তায় আগমন করবে। কাজেই আমরা যদি মাহ্‌দি-বাহিনীর লক্ষণগুলো সমগ্র খোরাসানে অনুসন্ধান করি, তা হলে তা আফগানিস্তানের সেই ভূখণ্ডটিতে পরিদৃষ্ট হবে, যেখানে বর্তমানে পাখতুন বসতি বেশি। তাই লক্ষ্যণদৃষ্টে বলা যায়, হযরত মাহ্‌দির সহায়তাকারী বাহিনীটি খোরাসানের সেই অঞ্চল থেকে গমন করবে, যেটি বর্তমানে তালেবান আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

অপর এক বর্ণনায় দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল হিসেবে ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী একটি জায়গার কথা বলা হয়েছে। ফলে এখানে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিরোধের সমাধান হলো, দাজ্জালের আবির্ভাব ইস্‌ফাহান থেকেই ঘটবে। তবে তার প্রচার ও খোদায়ী দাবির ঘটনা ঘটবে ইরাকে। এই হিসেবে একেও 'আবির্ভাব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের স্থান ইস্‌ফাহানের ইহুদিয়া নামক একটি জায়গার কথা বলা হয়েছে। বুখতেনাচ্চর যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন বহুসংখ্যক ইহুদি এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই থেকে এ-অঞ্চলটির নাম হয়েছে ইহুদিয়া। ইহুদিদের মাঝে ইস্‌ফাহানের

১৯. *মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৫*
২০. *মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭; সুনানে ইবনে মাজা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৫৩; মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭*

একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এক হাদীছে বলা হয়েছে, দাজ্জালের সঙ্গে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে।

হাদীছের এই বক্তব্য থেকেও ইস্‌ফাহানি ইহুদিদের বিশেষ গুরুত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। প্রিন্স করীম আগাখানের বংশের সম্পর্কও ইস্‌ফাহানের সঙ্গে। এই বংশটি উপমহাদেশে স্বজাতির পক্ষে যেসব সেবা আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে, তা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, দাজ্জাল যদি এযুগে এসে পড়ে, তা হলে এই পরিবার দাজ্জালের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্ব আছে, যারা ইস্‌ফাহানি ইহুদি এবং বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী।

ইরাক সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা

هَيْثَمُ بْنُ مَالِكٍ الطَّائِيُّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ يَلِي الدَّجَّالُ بِالْعِرَاقِ سَنَتَيْنِ يُحْمَدُ فِيهَا عَدْلُه' وَتَشْرَأَبُّ النَّاسُ إِلَيْهِ فَيَصْعَدُ يَوْمًا الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ بِهَا ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ مَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا رَبَّكُمْ فَيَقُولُ لَه' قَائِلٌ وَمَنْ رَبُّنَا فَيَقُولُ أَنَا فَيُنْكِرُ مُنْكِرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ عِبَادِ اللهِ قَوْلَه' فَيَأْخُذُه' فَيَقْتُلُه'

হায়ছাম ইবনে মালেক আত-তায়ী বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জাল দুই বছর ইরাক শাসন করবে। তাতে তার সুশাসন প্রশংসিত হবে এবং মানুষ তার প্রতি ধাবিত ও আকৃষ্ট হবে। দুই বছর পর একদিন সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবে। তখন জনতাকে উদ্দেশ করে বলবে, এখনও কি সময় আসেনি, তোমরা তোমাদের প্রভুর পরিচয় লাভ করবে? এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করবে, আমাদের প্রভু কে? দাজ্জাল বলবে, আমি। আল্লাহর এক বান্দা তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাকে ধরে হত্যা করে ফেলবে।'[২১]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّه' مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُه' مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ

ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণণা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে-ই দাজ্জালের আবির্ভাবের সংবাদ শুনবে, সে-ই যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর শপথ, এমন ঘটনা ঘটবে যে, কোনো লোক এমন

২১. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৯*

অবস্থায় তার কাছে আসবে, সে নিজেকে মুমিন ভাবছে; কিন্তু এসে তার কর্মকাণ্ডে সন্দেহে নিপতিত হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে।'[২২]

দাজ্জালের ফেতনা সম্পদ, সৌন্দর্য ও শক্তি– মোটকথা সকল বিষয়ে হবে। আর জগত তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে শহর-নগরে অবস্থান করে থাকে। যে-অঞ্চল শহর থেকে যত দূরে হবে, সেখানে দাজ্জালের ফেতনা তত কম হবে। উম্মে হারামের হাদীছেও এ-বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে, মানুষ দাজ্জাল থেকে এত পলায়ন করবে যে, তারা পাহাড়ে চলে যাবে।

দাজ্জালের সঙ্গে তামীমদারি (রা.)-এর সাক্ষাত

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনলাম, 'নামায প্রস্তুত।' শুনে আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতে নামায আদায় করলাম। আমি মহিলাদের সেই সারিটিতে ছিলাম, যেটি পুরুষদের একেবারে পেছনে ছিল।

নামায সমাপ্ত করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিটিমিটি হাসতে-হাসতে মিম্বরে উঠে বসলেন এবং বললেন, 'প্রত্যেকে নিজ-নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকো।' তারপর বললেন, 'তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন সমবেত করেছি?'

সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান কিংবা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সমবেত করিনি। আমি তোমাদেরকে একটি ঘটনা শোনাব। তামীমদারি নামে এক খ্রিস্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেছে। সে আমাকে একটি ঘটনা বলেছে, যেটি আমি দাজ্জাল সম্পর্কে আগে যা বলেছি, তার অনুরূপ। সে আমাকে বলেছে, আমরা বনু লাখ্ম ও বনু জুযামের ত্রিশজন লোক নিয়ে নৌভ্রমণে বের হয়েছিলাম। সমুদ্রের তরঙ্গ এক মাস যাবত আমাদের নিয়ে দুলতে থাকল। এক পর্যায়ে আমরা একটি দ্বীপে গিয়ে উপনীত হলাম। তখন সময়টা ছিল সন্ধ্যাবেলা। আমরা ছোট-ছোট ডিঙিতে করে নেমে দ্বীপের ভেতরে ঢুকে গেলাম। ওখানে আমরা বিস্ময়কর প্রকৃতির একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেলাম, যার মাথায় মোটা ও ঘন চুল ছিল। চুলের আধিক্যের কারণে আমরা বুঝতে পারিনি, প্রাণীটি আসলে কী।

আমরা বললাম, তোমার ধ্বংস হোক, কে তুমি?

২২. *সুনানে আবী দাউদ ॥ হাদীছ নং ৩৭৬২*

প্রাণীটি বলল, আমি 'জাস্সাসা'।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'জাস্সাসা' কী?

সে বলল, তোমরা গির্জায় সেই লোকটির নিকট যাও, যে তোমাদের সংবাদ নিয়ে খুবই বিচলিত।

প্রাণীটি যখন তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, ওটা শয়তান কিনা! আমরা তাড়াতাড়ি গির্জায় চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, ভেতরে বৃহদাকৃতির এমন একজন লোক বসে আছে যে, এমন ভয়ানক মানুষ আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। লোকটির হাতদুটো কাঁধ পর্যন্ত আর পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত শিকল দ্বারা বাঁধা।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ধ্বংস হোক, কে তুমি?

সে বলল, তোমরা যখন আমাকে পেয়েই গেছ আর আমাকে চিনে ফেলেছ, তা হলে বলো, তোমরা কারা?

আমরা বললাম, আমরা আরবের লোক।

সে জিজ্ঞেস করল, বায়সানের খেজুর গাছগুলোতে ফল ধরছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, ধরছে তো।

সে বলল, সেই সময়টি নিকটে, যখন সেগুলোতে ফল ধরবে না। তারপর জিজ্ঞেস করল, তাবরিয়া উপসাগরে পানি আছে কি?

আমরা বলল, হ্যাঁ, আছে।

সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে তার পানি শুকিয়ে যাবে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, যুগার কূপের অবস্থা কী? তাতে পানি আছে কি? তার পার্শ্ববর্তী মানুষ সেই পানি দ্বারা কৃষি কাজ করে কি?

আমরা বললা, হ্যাঁ।

তারপর জিজ্ঞেস করল, নিরক্ষর লোকদের নবীর সম্পর্কে বলো; তিনি কী করেছেন?

আমরা বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে গেছেন।

সে জিজ্ঞেস করল, আরবরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, তিনি আরবদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন?

তামীমদারি জানায়, আমরা তাকে পুরো ঘটনা শোনালাম যে, আরবে যারা সজ্জন ছিল, তিনি তাদের জয় করে নিয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

শুনে লোকটি বলল, তাঁর আনুগত্য মেনে নেওয়াই ভালো। এবার আমি তোমাদেরকে আমার ইতিবৃত্ত বলছি। আমি মাসীহ। অচিরেই আমাকে আত্মপ্রকাশের আদেশ দেওয়া হবে। আমি বাইরে বের হব এবং সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করব। এমনকি আমি এমন কোনো জনবসতি বাদ রাখব না, যেখানে আমি

প্রবেশ করব না। চল্লিশ রাত একটানা ঘুরতে থাকব। কিন্তু মক্কা ও মদীনায় যাব না। ওখানে যেতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। আমি যখন তার কোনোটিতে ঢুকতে চেষ্টা করব, তখন একজন ফেরেশতা তরবারি হাতে নিয়ে আমাকে প্রতিহত করবে। ওই শহরগুলোর প্রতিটি সড়কে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে।'

এই ঘটনাটি শোনানোর পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দ্বারা মিম্বরের উপর আঘাত করে বললেন, 'এই হলো তায়্যেবা – এই হলো তায়্যেবা; মানে মদীনা।' তারপর তিনি বললেন, 'শোনো, আমি তোমাদেরকে এ-বিষয়টিই বলতাম। মনে রেখো, দাজ্জাল শাম কিংবা ইয়েমেনের কোনো সাগরে নেই। সে পূর্বের কোনো একস্থানে আছে। সে পূর্বের কোনো একস্থানে আছে। সে পূর্বের কোনো একস্থানে আছে।'[২৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামীমদারির ঘটনাটি শোনানোর পর প্রথমে বললেন, দাজ্জাল শামের নদীতে আছে কিংবা ইয়েমেনের নদীতে আছে। কিন্তু পরক্ষণে এই অভিমত প্রত্যাহার করলেন এবং তিনবার বললেন, সে পূর্বদিকে আছে।

এ-ব্যাপারে আলেমগণ বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে যখন বলেছেন, তখন অহীর মাধ্যমে তাকে অবহিত করা হয়েছিল, দাজ্জাল প্রাচ্যে আছে। এ-কারণেই তিনি পূর্বের তথ্যটি প্রত্যাহার করে নিয়ে পরের তথ্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। তিনি বিষয়টি এ-পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখলেন এবং দাজ্জালের অঞ্চল ও অবস্থানকে আর বেশি চিহ্নিত করলেন না। তাই আমরাও আলোচনাটির এখানেই ইতি টানছি।

দাজ্জালের প্রশ্নসমূহ ও বর্তমান পরিস্থিতি

দাজ্জাল তামীমদারির কাফেলার লোকদেরকে বায়সানের খেজুর বাগান, যুগার কূপ, তাবরিয়া উপসাগর ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। চিন্তা করলে আপনি দেখতে পারেন, এই চারটি প্রশ্নের মধ্যে তিনটিই পানিসংক্রান্ত। তা ছাড়া এ-ও বুঝতে পারবেন যে, এই স্থানগুলোর সঙ্গে দাজ্জালের নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে।

বায়সানের বাগান

বায়সান আগে ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলে হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) অঞ্চলটি জয় করে নিয়েছিলেন।[২৪]

২৩. *সহীহ মুসলিম ॥ হাদীছ নং ৫২৩৫*
২৪. *তারীখে তাবারি, মু'জামুল বুলদান*

খেজুর বাগানের সঙ্গে বায়সানের সম্পর্ক কী? এর উত্তর হলো, বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত হামাবি (মৃত্যু ৬২৬ হিজরী) মু'জামুল বুলদানে লিখেছেন, বায়সান খেজুরের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমি সেখানে একাধিকার গিয়েছি। কিন্তু সেখানে আমি পুরাতন দুটি খেজুর বাগান ছাড়া আর কোনো বাগান দেখিনি।[২৫]

বর্তমানে বায়সান খেজুরের জন্য বিখ্যাত নয়। এ-সময় খেজুরের জন্য বিখ্যাত হলো পশ্চিম তীরের আরিহা। বায়সানের কিছু অঞ্চল এখনও জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলটি জর্ডানের গুর শহরে অবস্থিত। আর গুর অঞ্চলে বর্তমানে গম ও নানা ধরনের সবজি উৎপাদিত হয়। তা ছাড়া জর্ডানের কৃষির ভবিষ্যতও তেমন ভালো নয়।

জর্ডান ইয়ারমুক নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। পূর্ব ক্যানল আরিগেশন প্রজেক্টের জন্য জর্ডান ইয়ারমুক নদীর পানিকে গুর শহরের নিকটে নিয়ে এসেছে। গুর-এর এই প্রজেক্টেরই মাধ্যমে জর্ডানের ভূমিকে সিঞ্চিত ও পরিতৃপ্ত করা হয়। ইয়ারমুক নদীটি এসেছে গোলানের পর্বতমালা থেকে।

তাবরিয়া উপসাগরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব

দাজ্জালের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল তাবরিয়া উপসাগর বিষয়ক। বর্তমানে এই নদীটির উপরও ইসরাইলের কব্জা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 'এনসাইক্লুপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা'র মতে, এই নদীটিকে ইংরেজিতে 'লেক অফ তিবরিজ' কিংবা 'সী অফ গ্যালিলি' বলা হয়। হিব্রু ভাষায় বলা হয় 'ইয়াম কিন্নরিত'। তাবরিয়া উপসাগরের আশপাশে নয়টি শহর আছে, তাবরিয়া যার একটি। এই তাবরিয়া ইহুদিদের চার পবিত্র নগরীর একটি। এই নগরীর একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে।

৭০ খ্রিস্টসনে যখন রোমরাজা তাইতাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করেছিল, তখন ইহুদি ধর্মনেতারা – যাদেরকে রিব্বি বলা হয় – তাবরিয়া এসে জড়ো হয়েছিল। ইহুদি ধর্মনেতাদের দ্বারা এখানে উচ্চপর্যায়ের একটি বিচারালয় গঠিত হয়েছিল। এই আদালতের বিচার-ফয়সালারই আলোকে তৃতীয় ও পঞ্চম শতাব্দিতে ইহুদিদের ধর্ম ও নাগরিক আইন গ্রন্থ 'তালমুদ' সংকলিত হয়েছিল। ১২০০ খ্রিস্টসনে ইহুদিরা তাদের অপকর্মের কারণে তাবরিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়। পরে ১৮০০ সনে পুনরায় এখানে এসে তারা বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই নগরীটি একটি পর্যটনকেন্দ্র। (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা ২০০৫)।

এই অঞ্চলটি সর্বপ্রথম সুরাহবিল ইবনে হাসানা (রাযি.) জয় করেছিলেন। পরে তার অধিবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করলে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) অঞ্চলটি পুনরায় জয় করেন।

২৫. *মু'জামুল বুলদান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২৭*

মু'জামুল বুলদানের তথ্যমতে, এখানে পুরাতন একটি ইমারত আছে, যাকে 'হাইকেলে সুলায়মানি' বলা হয়। তার মধ্য থেকে পানি নির্গত হয়। এখানে গরম পানির কূপ আছে। বায়সান ও গুর-এর মধ্যখানে একটি গরম পানির কূপ আছে, যেটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নামে পরিচিত। এই কূপ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস হলো, এতে যেকোনো রোগের নিরাময় আছে। তাবরিয়া উপসাগরের মধ্যখানে একটি কাঁটাদার চটান আছে, যার উপরে আরও একটি চটান আছে, যেটি অনেক দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। সে সম্পর্কে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা হলো, এটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কবর।[২৬]

তাবরিয়া উপসাগর ও বর্তমান পরিস্থিতি

তাবরিয়া উপসাগর বর্তমান পূর্ব ইসরাইলে জর্ডান সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত। এ-সময়ও তাতে মিষ্টি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তমানে তার দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৩ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য বেশিরভাগ উত্তর দিকে, যার পরিমাণ ১৩ কিলোমিটার। তার সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫৭ ফুট। মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ১৫৬ কিলোমিটার। বর্তমানে তাতে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

বর্তমানে তাবরিয়া উপসাগর ইসরাইলের মিষ্টি পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর এই সাগরের পানির প্রধান মাধ্যম হলো জর্ডান নদী, যেটি গোলান পর্বতমালার ধারা জাবালুস-শায়খ থেকে এসেছে। ইসরাইল এখন যে-কাজটি করেছে, তা হলো তারা আগে-ভাগেই তাবরিয়া উপসাগরের গতি ঘুরিয়ে ইসরাইলের দিকে নিয়ে গেছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করছে। অবশিষ্ট পানিগুলো তারা মরুভূমিতে নিয়ে ফেলছে, যাতে মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করা যায়। এর ফলে জর্ডানের ভূমি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে তাবরিয়া উপসাগরও শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যুগারের কূপ

দাজ্জালের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল যুগারের কূপ সম্পর্কে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, আল্লাহ যখন লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন লূত (আ.)-কে সাদ্দুম পল্লী থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন। হযরত লূত (আ.) তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান। তাদের একজনের নাম রাবাহ, অপরজনের নাম যুগার। বড় মেয়েটি মৃত্যুবরণ করলে তাকে একটি কূপের কাছে দাফন করে রাখেন। সেই সূত্রে কূপটির নাম হয়ে গেল 'রাবাহ কূপ'। পরবর্তী সময়ে অপর মেয়ে যুগার মৃত্যুবরণ করলে

২৬. *মু'জামুল বুলদান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮*

তাকেও আরেকটি কূপের কাছে দাফন করলেন। এভাবে সেই কূপটির নাম পড়ে গেল 'যুগার কূপ'।[২৭]

আবু আবদুল্লাহ হামাবি মু'জামুল বুলদানে যুগার কূপ ইসরাইলের মৃত সাগরের (ডেড সী) পূর্বে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

বাইবেলের ভাষ্যমতে, লূত সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হওয়ার পর হযরত লূত (আ.) যে-অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন, তার নাম 'যূর', বর্তমানে যার অবস্থান মৃতসাগরের পূর্ব দিকে জর্ডানের ভেতরে। অঞ্চলটির বর্তমান নাম 'আস-সাফী'।

গোলান পর্বতমালার ভৌগোলিক গুরুত্ব

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল সিরিয়া থেকে গোলানের পর্বতমালাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। জাবালুশ-শায়খ গোলানের পাহাড়ি ধারার সবচেয়ে উঁচু চূড়া, যেখান থেকে একদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং অপরদিকে দামেশ্‌ক একেবারে তার নিচে পরিদৃশ্য হয়। তার উচ্চতা ৯২৩২ ফুট। বর্তমানে জাবালুশ-শায়খের উপর লেবানন, সিরিয়া ও ইসরাইলের কব্জা প্রতিষ্ঠিত। কিছু এলাকা জাতিসংঘের অসামরিক অঞ্চল। পানির দিক থেকে জাবালুশ-শায়খ মুক্ত অঞ্চল। এভাবে ভৌগোলিক দিক থেকেও এবং পানির বিবেচনায়ও এই পাহাড়ি ধারা উক্ত অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

এবার আমরা যদি দাজ্জালের পক্ষ থেকে বায়সান, তাবরিয়া উপসাগর ও যুগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করি, তা হলে প্রতীয়মান হবে যে, তার এই প্রশ্নগুলোর সম্পর্ক মূলত গোলান পর্বতমালার সঙ্গে। তা ছাড়া সেই হাদীছগুলোকেও সামনে রাখতে হবে, যেগুলোতে তাবরিয়া উপসাগর, বাইতুল মুকাদ্দাস ও আফীক ঘাঁটির উল্লেখ রয়েছে। তাতেও গোলান পর্বতমালার গুরুত্বই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সর্বোপরি একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যে-মহাযুদ্ধের ধারণা লালন করে যে, মহাযুদ্ধ মেগ্ড-এর মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, এই মাঠের অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের কাছাকাছি পশ্চিমে। আফীক-এর যে-ঘাঁটিতে দাজ্জাল মুসলমানদের যে-অবরোধটি করবে, তার অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের দক্ষিণে। এভাবে এই সবগুলো অঞ্চল গোলানের পর্বতমালার একেবারে নিচে। অনুরূপভাবে ইসরাইল-ফিলিস্তিন ও ইসরাইল-সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলসংক্রান্ত বিরোধের সংবাদগুলোতে যদি চিন্তা করা হয়, তা হলে সহজেই বুঝে আসবে যে, বিশ্ব কুফরিশক্তি কোন বিষয়গুলোকে সামনে রেখে পরিকল্পনা

২৭. *মু'জামুল বুলদান ॥ খণ্ড :৩, পৃষ্ঠা : ২৬*
২৮. *মু'জামুল বুলদান*

প্রস্তুত করছে এবং ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করতে সমস্ত কুফরিশক্তি কেন ইসরাইলের সঙ্গ দিচ্ছে।

দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করবে না

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ

হযরত আবু বাক্‌রাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জালের প্রভাব মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে-সময় মদীনার সাতটি ফটক থাকবে। প্রতিটি ফটকে দুজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে।'[২৯]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَدْخُلُه' الدَّجَّالُ إِلَّا الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَأَنَّه' لَيْسَ بَلَدٌ إِلَّا سَيَدْخُلُه' رُعْبُ الْمَسِيْحِ إِلَّا الْمَدِيْنَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا يَوْمَئِذٍ مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيْحِ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন কোনো নগরী নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না – দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। আর এমন কোনো নগরী নেই, যেখানে দাজ্জালের প্রভাব প্রবেশ করবে না – মদীনা ব্যতীত। মদীনার প্রতিটি প্রবেশদ্বারে সেদিন দুজন করে ফেরেশতা থাকবে, যারা তার থেকে দাজ্জালের প্রভাবকে প্রতিহত করবে।'[৩০]

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْنِيْ أُمُّ شَرِيْكٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيْلٌ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, উম্মে শুরাইক আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি নবীজি (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'নিঃসন্দেহে মানুষ দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে পাহাড়ে চলে যাবে।' একথা শুনে উম্মে শুরাইক জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আরবরা সেদিন কোথায় থাকবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তারা অল্প হবে।'[৩১]

---

২৯. *সহীহ বুখারী ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৫৫*
৩০. *মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮৪*
৩১. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৬৬*

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে দাজ্জালের ফেতনা ও তার মিথ্যা দাবি-দাওয়া বিষয়ক আলোচনা শুনে উম্মে শুরাইক (রাযি.) যে-প্রশ্নটি করেছিলেন, তার অর্থ হলো, আরবরা তো সত্যের জন্য জীবন কুরবান করে দেওয়ার মতো মানুষ। তারা যেকোনো মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। এমতাবস্থায় তারা থাকা সত্ত্বেও দাজ্জাল এসব কীভাবে করতে সক্ষম হবে? এ-প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তার মর্ম হলো, শোনো উম্মে শুরাইক, সেই আরব তখন খুবই অল্প হবে, জিহাদই যাদের মিশন হবে। অন্যথায় সংখ্যায় আরবরা অনেক হবে। তুমি যে-আরবদের কথা বলছ, তারা অনেক কম হবে।

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযি.)-এর হাদীছ

হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও নিচু হয়ে যাচ্ছিল, আবার কখনও উঁচু হচ্ছিল। (তাঁর বক্তব্যের ধারায়) আমাদের মনে ধারণা জন্মাল, দাজ্জাল খেজুর বাগানের মধ্যে আছে। পরে সন্ধ্যায় যখন আমরা তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাদের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হয়েছে?

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আপনার স্বর কখনও নিচু হচ্ছিল, কখনও উঁচু হচ্ছিল। ফলে আমাদের মনে ধারণা জন্মাল, দাজ্জাল বোধ হয় খেজুর বাগানে আছে।

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ও যদি আমার উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তোমাদের পক্ষে আমিই যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আপন-আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের হেফাজতকারী। দাজ্জাল তরতাজা যুবক হবে। তার চোখ বোজা থাকবে। সে আবদুল ওয্‌যা ইবনে কাতান-এর মতো হবে। তোমাদের যে-ই তাকে পাবে, সে যেন সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দিককার কটি আয়াত পাঠ করে। ইরাক ও শামের মধ্যখানে যে-রাস্তাটি আছে, সে ওই পথে আত্মপ্রকাশ করবে। সে ডানে-বাঁয়ে বিপর্যয় ও অরাজকতা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দাজ্জালের মোকাবেলায় দৃঢ়পথ থেকো।'

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়াতে সে কত দিন থাকবে?

নবীজি (সা.) উত্তর দিলেন, 'চল্লিশ দিন। প্রথম একটি দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান হবে। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতো হবে।'

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তার ভ্রমণের গতি কেমন হবে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেই বৃষ্টির গতির মতো, বাতাস যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে (তাকে রব মেনে নেওয়ার) আহ্বান জানাবে। তারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে যা-যা বলবে, সব মেনে নেবে। ফলে দাজ্জাল (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে) আকাশকে আদেশ করবে, ফলে বৃষ্টি হবে। সে মাটিকে আদেশ করবে, ফলে মাটি ফসল উৎপাদন করে দেবে। সন্ধ্যার সময় যখন তাদের পশুপাল ফিরে আসবে, তখন (পেট ভরে খাওয়ার কারণে) তাদের চুটগুলো উত্থিত থাকবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ হবে। তাদের পাগুলো (বেশি খাওয়ার ফলে) ছড়ানো থাকবে। তারপর দাজ্জাল অপর একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু তারা তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে, যার ফলে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়বে এবং ধন-সম্পদ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

দাজ্জাল একটি অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাকে আদেশ করবে, তুমি তোমার ধন-ভাণ্ডার বের করে দাও। জমি তার ধন-ভাণ্ডারকে বের করে দিয়ে তার পেছনে এমনভাবে চলতে শুরু করবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের নেতার পেছনে চলে থাকে। তারপর সে তাগড়া এক যুবককে ডেকে আনবে এবং তরবারির এক আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। খণ্ডদুটি এত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, লক্ষ্যে-ছোড়া-তির যত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার দাজ্জাল (তাকে দুই টুকরা হয়ে যাওয়া যুবককে) ডাক দেবে। সঙ্গে-সঙ্গে যুবক উঠে তার কাছে চলে আসবে। এই ধারা চলতে থাকবে। এরই মধ্যে আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে পাঠিয়ে দেবেন।'[৩২]

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, দাজ্জাল উক্ত যুবকের উপর প্রথমে অনেক নির্যাতন চালাবে। তার কোমরে ও পিঠে বেদম প্রহার করবে। তারপর জিজ্ঞেস করবে, এবার বলো, আমার উপর ঈমান আনছ কি? যুবক বলবে, তুমি দাজ্জাল। এবার দাজ্জাল তাকে করাত দ্বারা দুই পায়ের মধ্যখান দিয়ে চিড়ে ফেলতে আদেশ দেবে। তার আদেশ পালিত হবে। যুবককে তার দুই পায়ের মধ্যখান দিয়ে চিড়ে ফেলা হবে। তারপর দাজ্জাল তাকে জোড়া লাগিয়ে জিজ্ঞেস করবে, এবার মানছ কি আমাকে? যুবক বলবে, এখন তো আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, তুমি দাজ্জাল। তারপর যুবক জনতাকে উদ্দেশ করে বলবে, লোকসকল, আমার পরে এ আর কারও সঙ্গে এরূপ আচরণ করতে পারবে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারপর দাজ্জাল যুবককে যবাই

৩২. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৫০*

করার জন্য পাকড়াও করবে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার গলাটাকে পুরোপুরি তামায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে দাজ্জাল তাকে কাবু করতে পারবে না। এবার দাজ্জাল তার হাত ও পা ধরে ছুড়ে মারবে। মানুষ মনে করবে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ দাজ্জাল তাকে যেখানে নিক্ষেপ করেছে, সেটি হলো জান্নাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সমীপে এই যুবকের শাহাদাত শ্রেষ্ঠ শাহাদাত বলে গণ্য হবে।[৩৩]

সময় থেমে যাবে কি?

সময়ের থেমে যাওয়া দাজ্জালের জাদুর ক্রিয়া হবে কিংবা সে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এমনটি করবে। কেননা, সাহাবা কিরাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই অবস্থায় আমরা নামায কত ওয়াক্ত পড়ব? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, সময় অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে।

দাজ্জালি শক্তিগুলো সময়ের গতিকে রোধ করার লক্ষ্যে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন, 'টাইম মেশিন' নামে এমন একটি বস্তু আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, যার সাহায্যে মানুষকে বিগত সময়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। মানুষ মূলত বর্তমান সময়েই অবস্থান করবে; কিন্তু মেশিনটির সাহায্যে মনে হবে, এখনও বিগত সময়ের মধ্যে রয়েছে। এর স্পষ্ট চিত্র হয়ত শীঘ্রই বিশ্ববাসীর সামনে চলে আসবে।

সাহাবাগণের দাজ্জালের গতি ও দুনিয়াতে তার অবস্থানের মেয়াদকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা তাদের সামরিক চিন্তার প্রমাণ বহন করে। প্রশ্নটি করে তারা জানতে চেয়েছিলেন, আমাদেরকে দাজ্জালের সঙ্গে কত দিন যুদ্ধ করতে হবে। যেহেতু যুদ্ধে চলাচল ও দৌড়ঝাঁপ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, দাজ্জালের গতি কেমন হবে?

দাজ্জালের মেয়াদকালের প্রথম দিনটি এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান আর তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট ৩৭ দিন সাধারণ দিবসের মতো হবে। এই হিসাবে দাজ্জালের দুনিয়াতে অবস্থানের মেয়াদকাল এক বছর দুমাস চৌদ্দ দিনের সমান হয়।

এক দিন এক বছরের সমান হবে। কোনো-কোনো বিশ্লেষক দিবসের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই লিখেছেন যে, পেরেশানির কারণে দিনটি দীর্ঘ বলে মনে হবে। কিন্তু মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি (রহ.) লিখেছেন, হাদীছ-বিশেষজ্ঞদের মতে হাদীছ দ্বারা বাহ্যত যা বোঝা যাচ্ছে, বাস্তবে তা-ই এর মর্ম।

৩৩. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৫৬; মুসনাদে আবী ইয়া'লা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৪*

অর্থাৎ– প্রথম তিনটি দিন এতটাই দীর্ঘ হবে, যা হাদীছে বলা হয়েছে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনেরই মতো হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিই তার প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া সাহাবা কিরাম এই যে প্রশ্ন করেছেন, 'উক্ত দিনগুলোতে আমরা কত ওয়াক্ত নামায আদায় করব আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সময় হিসাব করে নামায আদায় করবে'– এ বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, এখানে প্রকৃত দীর্ঘতা-ই বোঝানো হয়েছে।

'দাজ্জাল তার ডানে ও বাঁয়ে বিপর্যয় ছড়াতে থাকবে'– একথার অর্থ হলো, সে যেখানেই যাবে, সেখানেই অনাচার ও বিপর্যয় তৈরি হবে। তার ডানে-বাঁয়ে তার এজেন্টরা বিপর্যয় তৈরি করতে থাকবে। যেমনটি আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, প্রধান সেনাপতি বিশেষ-বিশেষ জায়গায় যান । অবশিষ্ট স্থানগুলোতে তার অধীনদের পাঠিয়ে দেন। আমাদের এই দাবির পক্ষে সেই বর্ণনাগুলো প্রমাণ বহন করছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে, দাজ্জাল যখন এক যুবক সম্পর্কে সংবাদ পাবে, সে তাকে মন্দ বলছে, তখন সে তার লোকদেরকে বার্তা পাঠাবে, অমুক যুবককে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসো। নু'আঈম ইবনে হাম্মাদ 'আলাফিতানে' এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, দাজ্জাল ছাড়াও তার লোকেরা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবে আর দাজ্জাল স্থানে-স্থানে গিয়ে তাদের দেখভাল করবে।

দাজ্জালের অর্থনৈতিক ও কৃষিবিষয়ক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

ইবনে সায়্যাদের বর্ণনা

দাজ্জাল অধ্যায়ে আমি ইবনে সায়্যাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সঙ্গত মনে করছি। ইবনে সায়্যাদ একজন ইহুদি ছিল। লোকটি মদীনায় বাস করত। তার আসল নাম ছিল 'ছাফ'। সে জাদু ও ভেল্‌কিবাজিতে খুব পারদর্শী ছিল। দাজ্জালের মধ্যে যেসব লক্ষণ থাকার কথা রয়েছে, তার মধ্যে তার অনেকাংশই পাওয়া যেত। এ-কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ইবনে সায়্যাদের ব্যাপারে খুব চিন্তিত থাকতেন এবং তার প্রকৃত পরিচয় জানতে একাধিকবার তার কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তার ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল কিনা। অনুরূপভাবে শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবাও ইবনে সায়্যাদকেই দাজ্জাল মনে করতেন। এখানে এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীছ উদ্ধৃত করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) একদল সাহাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ইবনে সায়্যাদ-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে বনু মাগালায়

(ইহুদিদের একটি পল্লী) ক্রীড়ারত অবস্থায় পেলেন। বয়সে তরুণ। ইবনে সায়্যাদ তাদের গমনের সংবাদ টের পেল না। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে হাত রাখলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

প্রশ্নটি শুনে ইবনে সায়্যাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানে তাকাল এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞ লোকদের রাসূল। তারপর সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো তুমি কী দেখছ? অর্থাৎ– অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি কী-কী দেখতে পাও? সে বলল, কখনও তো আমার কাছে সঠিক সংবাদ আসে, আবার কখনও মিথ্যা আসে।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পুরো বিষয়টিই এলোমেলো হয়ে গেছে। তারপর বললেন, আমি তোমার জন্য হৃদয়ে একটি কথা লুকিয়ে রেখেছি।

সে বলল, সেই গোপন বিষয়টি হলো ধোঁয়া।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দূর হও; তুমি তোমার সময় থেকে একটুও অগ্রসর হতে পারবে না।

এই পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রাযি.) বলে ওঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অনুমতি দিন, আমি ওর ঘাড়টা উড়িয়ে দিই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইবনে সায়্যাদ যদি সেই দাজ্জাল হয়, তা হলে তুমি তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে না হয়, তা হলে একে হত্যা করায় কোনো লাভ নেই।

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের সেই গাছগুলোর কাছে গমন করলেন, যেখানে ইবনে সায়্যাদ অবস্থান করছিল। তখন উবাই ইবনে কা'ব আনসারি (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওখানে পৌঁছে কতগুলো খেজুর ডালের পেছনে লুকোতে শুরু করলেন, যাতে ইবনে সায়্যাদ টের পাওয়ার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নিতে পারেন। ইবনে সায়্যাদ তখন গায়ে চাদর মুড়িয়ে শুয়ে ছিল এবং ভেতর থেকে গুনগুনানির শব্দ আসছিল। এই সময় ইবনে সায়্যাদের মা খেজুর ডালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নবীজিকে দেখে ফেলল এবং বলে উঠল, হে ছাফ, এই যে মোহাম্মদ এসেছে।

শুনে ইবনে সায়্যাদ গুনগুনানি বন্ধ করে দিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওর মা যদি ওকে সতর্ক না করত, তা হলে আজ সে তার আসল রূপ প্রকাশ করে দিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, এই ঘটনার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতে জনতার সামনে দাঁড়ালেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। তারপর দাজ্জালের আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। নূহ-এর পরে এমন কোনো নবী অতিবাহিত হননি, যারা আপন জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহও তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা ইতিপূর্বে কোনো নবী বলেননি। তোমরা জেনে রাখো, দাজ্জাল হবে কানা আর নিশ্চিত জানো, আল্লাহ কানা নন।'[৩৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, একদিন (রাস্তায়) ইবনে সায়্যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে-সময় তার চোখ ফোলা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার চোখে এই ফোলা কবে থেকে? সে বলল, আমার জানা নেই। আমি বললাম, চোখ হলো তোমার মাথায় আর তুমি জান না? সে বলল, আল্লাহ চাইলে এই চোখটি তোমার লাঠিতে সৃষ্টি করে দিতে পারেন। ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, এই কথোপকথনের পর ইবনে সায়্যাদ তার নাক থেকে সজোরে এমন একটি শব্দ বের করল, যা গাধার শব্দের মতো ছিল।[৩৫]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুন্‌কাদির তাবেয়ী (রহ.) বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-কে দেখেছি যে, তিনি কসম খেয়ে বলতেন, ইবনে সায়্যাদ দাজ্জাল। আর নবীজি তা অস্বীকার করেননি।[৩৬]

হযরত নাফে' (রহ.) বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল। ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী মাযাহিরে হক জাদীদ-এর সূত্রে 'কিতাবুল বা'ছি ওয়ান নুশূর'-এ এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু বাক্‌রাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দাজ্জালের পিতামাতা ত্রিশ বছর যাবত এমন অবস্থায় অতিবাহিত করবে যে, তাদের কোনো সন্তান জন্মাবে না। ত্রিশ বছর পর

৩৪. *সহীহ বুখারী ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১১২; সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৪৪*

৩৫. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৮*

৩৬. *সহীহ বুখারী ॥ হাদীছ নং ৬৯২২; সহীহ মুসলিম হাদীছ নং ২৯২৯*

তাদের ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেবে, যার বড়-বড় দাঁত থাকবে। সে অল্প উপকারী হবে। তার চোখ দুটো ঘুমোবে বটে; কিন্তু অন্তর ঘুমোবে না।

এটুকু বলার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে তার পিতামাতার অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, তার পিতা অস্বাভাবিক দীর্ঘকায় হবে এবং শরীরে গোশত কম হবে। তার নাক মোরগের চঞ্চুর মতো (লম্বা ও সরু) হবে। তার মা হবে মোটা, চওড়া ও দীর্ঘ হাতের অধিকারী।

আবু বাক্‌রাহ (রাযি.) বলেন, আমরা মদীনার ইহুদিদের মাঝে একটি (বিরল ও বিস্ময়কর) ছেলের উপস্থিতির কথা শুনলাম। তখন আমি ও যুবাইর ইবনে আওয়াম তাকে দেখতে গেলাম। আমরা ছেলেটির পিতামাতার নিকট পৌঁছে দেখলাম, তারা হুবহু তেমন, যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছে। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোনো পুত্রসন্তান আছে কি? তারা বলল, আমরা ত্রিশটি বছর এভাবে অতিবাহিত করলাম যে, আমাদের কোনো পুত্রসন্তান জন্মায়নি? পরে আমাদের ঘরে একটি কানা পুত্রসন্তান জন্মাল, যার দাঁতগুলো বড়-বড় এবং কম হিতকর। তার চোখদুটো ঘুমোয় বটে; কিন্তু অন্তর ঘুমোয় না।

আবু বাক্‌রাহ বলেন, আমরা ওখান থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। এবার হঠাৎ উক্ত ছেলেটির উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হলো। ছেলেটি রোদের মধ্যে গায়ে চাদর জড়িয়ে পড়ে ছিল এবং চাদরের মধ্য থেকে এমন এক গুনগুনানির শব্দ আসছিল, যার কোনো মর্ম বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলতে শুরু করলাম। হঠাৎ ছেলেটি মাথা থেকে চাদর সরিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী বলছ? আমরা বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি কি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ? সে বলল, হ্যাঁ, আমার চোখ ঘুমোয়; কিন্তু অন্তর ঘুমোয় না।[৩৭]

হযরত আবু সাইদ খুদ্‌রি (রাযি.) বলেন, একবার মক্কার সফরে আমার ও ইবনে সায়্যাদের সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে তার সেই কষ্টের কথা ব্যক্ত করল, যা লোকদের দ্বারা সে পেয়েছিল। বলল, মানুষ আমাকে দাজ্জাল বলে। আবু সাঈদ, তুমি কি রাসূলে কারীমকে বলতে শোননি, দাজ্জালের কোনো সন্তান হবে না; অথচ আমার একাধিক সন্তান আছে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেননি যে, দাজ্জাল কাফের হবে; অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি একথা বলেননি যে, দাজ্জাল মদীনা ও মক্কায় প্রবেশ করবে না; অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি এবং মক্কায় যাচ্ছি?

৩৭. *সুনানে তিরমিযি ॥ হাদীছ নং ২২৪৮*

আবু সাঈদ (রাযি.) বলেন, ইবনে সায়্যাদ আমাকে সর্বশেষ কথাটি এই বলেছে যে, মনে রেখো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দাজ্জালের জন্মের সময় ও স্থান সম্পর্কে জানি। সে কোথায় আছে, তাও আমি বলতে পারি। তার পিতামাতাকেও চিনি।

আবু সাঈদ খুদ্রি (রাযি.) বলেন, ইবনে সায়্যাদের এসব কথা শুনে আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম। আমি বললাম, তুমি আজীবনের জন্য ধ্বংস হও। সে-সময় উপস্থিত লোকদের একজন ইবনে সায়্যাদকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি এটা পছন্দ হবে যে, তুমিই দাজ্জাল? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, দাজ্জালের যতো গুণ আছে, যদি তার সবগুলো আমাকে দেওয়া হয়, তাহলে আমি মন্দ ভাবব না।'[৩৮]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, ইবনে সায়্যাদ হাররার ঘটনার সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পরে আর কোনো দিন ফিরে আসেনি।'[৩৯]

ইবনে সায়্যাদ কি দাজ্জাল ছিল?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সায়্যাদ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। সাহাবা কিরামের মতো পরবর্তী আলেমগণেরও মাঝে এ-ব্যাপারে মতভেদ চলতে থাকে। যারা ইবনে সায়্যাদ-এর দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছেন, তাদের দলিল হলো, দাজ্জাল হবে কাফের। সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করবে না এবং তার কোনো সন্তান জন্মাবে না। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেন, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল, তাদের বক্তব্য হলো, তার মাঝে সেইসব লক্ষ্য বিদ্যমান ছিল, যেগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তার পিতামাতাও ঠিক তেমনই ছিল, যেমনটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন। তা ছাড়া ইবনে সায়্যাদ-এর উক্তি 'আমি দাজ্জালের জন্মের সময় ও স্থান সম্পর্কে জানি' এটিও তার নিজের দাজ্জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

এই পক্ষটি ইবনে সায়্যাদ-এর দাজ্জাল না-হওয়ার পক্ষের আলেমগণের দলিলের জবাবে বলেছেন, দাজ্জাল কাফের হবে একথা ঠিক। ইবনে সায়্যাদও কাফের ছিল। আবু সাঈদ খুদ্রি (রা.)-এর সফরসঙ্গীদের একজন যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তুমি দাজ্জাল? তখন সে উত্তর দিয়েছিল, দাজ্জালকে যেসব বিষয় দেওয়া হয়েছে, যদি আমাকেও সেসব দেওয়া হয়, তাহলে আমি দাজ্জাল হওয়া অপছন্দ করব না। তার এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দাজ্জাল তখনই ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

---

৩৮. *সহীহ মুসলিম ॥ হাদীছ নং ২৯২৭*
৩৯. *সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯৫*

অবশিষ্ট থাকল, মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করা-না-করার বিষয়টি।

এ-প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি বলেছেন–

وَأَمَّا إِظْهَارُهُ الْإِسْلَامَ وَحَجُّهُ وَجِهَادُهُ وَإِقْلَاعُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ الدَّجَّالِ

'তার ইসলাম প্রকাশ করা, হজ্ব করা, জিহাদ করা ও দুঃসময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা এসব ক্ষেত্রে তো একথা স্পষ্ট বলা হয়নি যে, সে দাজ্জাল ব্যতীত অন্য কেউ।'

শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের মধ্যে হযরত ওমর (রা.), হযরত আবুযর গিফারি (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও আরও একাধিক বিশিষ্ট সাহাবা ইবনে সায়্যাদ-এর দাজ্জাল হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।

ইমাম বুখারি (রহ.)ও ইবনে সায়্যাদ-এর দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত জাবির (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.) থেকে যে-হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তিনি সেটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তামীমদারি সম্পর্কিত হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.)-এর হাদীছটি তিনি উল্লেখই করেননি।[৪০]

যেসব আলেম ইবনে সায়্যাদকে দাজ্জাল মানেন না, তাদের দলিল হলো হযরত তামীমদারি-শীর্ষক হাদীছ। হাফিজ ইবনে হাজ্র ফাত্হুল বারীতে এসব আলোচনার পর বলেছেন, তামীমদারি-শীর্ষক হাদীছ ও ইবনে সায়্যাদ-এর দাজ্জাল হওয়া বিষয়ক হাদীছগুলোর মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, তামীমদারি (রাযি.) যাকে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন, সে দাজ্জালই ছিল। আর ইবনে সায়্যাদ ছিল শয়তান, যে এই পুরো সময়টিতে দাজ্জালের রূপ ধারণ করে ইস্ফাহান চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ওখানে গিয়ে সে তার বন্ধুদেরসহ সেই সময়ের জন্য গা-ঢাকা দিয়েছে, যতক্ষণ-না আল্লাহ তাকে আত্মপ্রকাশের শক্তি দান করবেন।[৪১]

তা ছাড়া ইবনে হাজ্র দলিল হিসেবে সেই বর্ণনাটিও উদ্ধৃত করেছেন, যেটি আবু নু'আইম তারীখে ইস্ফাহানে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হলো :

'হাস্সান ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা যখন ইস্ফাহান জয় করলাম, তখন আমাদের বাহিনী ও ইহুদিয়া নামক পল্লীর মধ্যখানে এক ক্রোশ পথের ব্যবধান ছিল। আমরা ইহুদিয়া যেতাম এবং সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি ক্রয় করে আনতাম।

'একদিন আমি ওখানে গেলাম। দেখলাম, ইহুদিরা নাচছে ও বাজনা বাজাচ্ছে। উক্ত ইহুদিদের মাঝে আমার এক বন্ধু ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস

---

৪০. *ফাত্হুল বারী ॥ খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২৮*
৪১. *ফাত্হুল বারী ॥ খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২৮*

করলাম, এরা নাচ-গান করছে কেন? সে বলল, আমাদের যে-সম্রাটের মাধ্যমে আমরা আরব বিশ্বকে জয় করব, তিনি আগমন করছেন।

'তার এই উত্তরে আমার মনে কৌতূহল জেগে গেল। রাতটা আমি তারই কাছে একটি উঁচু স্থানে অতিবাহিত করলাম। পরদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হলো, তখন আমাদের বাহিনীর দিক থেকে ধূলি উত্থিত হলো। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার গায়ে রায়হানের কাবা জড়ানো আর ইহুদিরা নাচ-গানে লিপ্ত। আমি লোকটিকে ভালোমতো দেখলাম। বুঝে ফেললাম, লোকটি ইবনে সায়্যাদ। পরক্ষণে সে ইহুদিয়া পল্লীতে ঢুকে গেল এবং পরে এ-পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি।'[৪২]

আলোচনাটি এখানেই শেষ করছি। যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ পর্যন্ত এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি, তাই বলতে হচ্ছে, প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন। এভাবে রহস্য লুকায়িত রাখার মধ্যে মহান আল্লাহর অনেক তাৎপর্য থাকে, যা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে।

সন্তান হলো পরীক্ষা

হযরত ইমরান ইবনে হুদাইর (রহ.) আবু মুজলিয (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু মুজলিয রহ.) বলেছেন, যখন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তখন মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। একটি দল (যুদ্ধের ময়দান থেকে) পালিয়ে যাবে। একদল মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। যে-ব্যক্তি চল্লিশ রাত পাহাড়ের চূড়ায় তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হবে। যেসব নামাযী তার সহযোগীতে পরিণত হবে, তাদের অধিকাংশ সন্তানের জনক-জননী হবে। তারা বলবে, আমরা এর (দাজ্জালের) গোমরাহি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানি। কিন্তু এর থেকে আত্মরক্ষা কিংবা এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘর-বাড়ি পরিত্যক্ত করতে পারি না। তো যারা এই নীতি অবলম্বন করবে, তারাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

দাজ্জালের জন্য দুটি ভূমিকে অনুগত বানিয়ে দেওয়া হবে। একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার ভূমি, যাকে সে বলবে, এটি জাহান্নাম। অপরটি সবুজ-শ্যামল ভূমি, যাকে সে বলবে, এটি জান্নাত। ঈমানওয়ালাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হবে। অবশেষে এক মুসলমান বলবে, আল্লাহর কসম, এই পরিস্থিতি আমি সহ্য করতে পারব না। আমি সেই লোকটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, যে মনে করছে, সে আমার রব। যদি প্রকৃতই সে আমার রব হয়, তা হলে আমি তার উপর

৪২. *ফাত্হুল বারী ॥ খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৭*

জয়ী হতে পারব না। তবে এখন আমি যে-অবস্থায় আছি, তার থেকে আমি মুক্তি পাব (অর্থাৎ আমি তার কাছে পরাজিত হব, সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে, আর আমি বর্তমানে যে-বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত আছি, তার থেকে রেহাই পেয়ে যাব)।

উক্ত মুসলমান তাকে বলবে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো; এ তো মস্ত এক বিপদ। এভাবে সে দাজ্জালের সঙ্গে বিদ্রোহের ঘোষণা দেবে এবং তার দিকে এগিয়ে যাবে। লোকটি দাজ্জালকে গভীরভাবে নিরীক্ষা করার পর তার বিরুদ্ধে গোমরাহি, কুফর ও মিথ্যার সাক্ষ্য প্রদান করবে। শুনে দাজ্জাল (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) বলবে, দেখো ব্যাপারটা; যাকে আমি সৃষ্টি করলাম ও পথের দিশা দিলাম, সে কিনা আমাকে মন্দ বলছে! লোকসকল, তোমরা কী মনে করছে, আমি যদি হত্যা করি, পরে আবার জীবিত করি, তা হলে এরপরও তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে কি? জনতা বলবে, না। এবার দাজ্জাল যুবকের গায়ে একটি আঘাত হানবে, যার ফলে তার দেহটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারপর আরেকটি আঘাত করবে, এবার সে জীবিত হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানওয়ালার ঈমান আরও বেড়ে যাবে এবং সে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কুফর ও মিথ্যার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই যুবক ব্যতীত দাজ্জালের আর কাউকে হত্যা করে জীবিত করার ক্ষমতা থাকবে না। পরে দাজ্জাল বলবে, দেখো, আমি একে হত্যা করে আবার জীবিত করেছি; কিন্তু তারপরও এ আমাকে মন্দ বলছে।

বর্ণনাকারী বলেন, দাজ্জালের কাছে একটি ছুরি থাকবে। সে মুসলমান যুবককে সেটি দ্বারা কাটতে চাইবে। কিন্তু তামা তার ও ছুরির মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ছুরি মুসলমান যুবকের উপর কোনোই ক্রিয়া করবে না। অনন্তর দাজ্জাল যুবককে ধরে তুলবে এবং বলবে, একে আগুনে নিক্ষেপ করো। ফলে তাকে সেই দুর্ভিক্ষকবলিত ভূমিতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে দাজ্জাল আগুন মনে করবে। অথচ বাস্তবে সেটি হবে জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা। আল্লাহ মুমিন যুবককে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন।[৪৩]

কিছু নামাযী মুসলমানও সন্তান-সন্ততির কারণে দাজ্জালের সঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ সন্তানকে পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছেন। মূলনীতি হলো, পরীক্ষার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। কাজেই যেসব দীনদার লোক ঈমানের অবস্থায় আপন রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের উচিত এখন থেকেই এই বিষয়টির অনুশীলন করা যে, আল্লাহর জন্য সন্তানদের পরিত্যাগ করতে পারবে কি-না। এই প্রস্তুতির সহজ পদ্ধতি হলো, তারা সেই পথে যেতে প্রস্তুত হয়ে যাক, যেপথ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো, ওখানে গেলে আর ফেরত

৪৩. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৭৮*

আসা যায় না কিংবা যে-ব্যক্তি ওখানে যায়, সে মৃত্যুবরণ করে। নিজেও বারবার এর অনুশীলন করুন এবং স্ত্রী-সন্তানদেরও এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে গোটা পরিবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাহায্যে দাজ্জালের সময় নিজের দীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য যেকোনো কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

দাজ্জালের কুফরি দেখে বহু মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এক যুবক সেসব সহ্য করতে ব্যর্থ হবে এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। তথাকথিত 'শান্তিকামী সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবী'রা তাকে বোঝাবেন, তুমি এমনটি করো না; বরং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সে অনুপাতে কাজ করো। কিন্তু কিছু হৃদয়ের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সঙ্গে জুড়ে যায়, তারা পাগল হয়ে যায় এবং যেকোনো তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা-ই তাদের ধর্মে পরিণত হয়ে যায়। এই যুবকও দাজ্জালের কুফরিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে বসবে।

দাজ্জালের অর্থনৈতিক প্যাকেজ

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَلْلَيْثِى قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَّبِعُه' نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ نَشْهَدُ اَنَّه' كَافِرٌ وَإِنَّمَا نَتَّبِعُه' لِنَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَنَرْعٰى مِنَ الشَّجَرِ فَإِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللهِ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا

হযরত ওবায়েদ ইবনে উমায়ের আল-লায়ছি বলেছেন, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। তখন কিছু মানুষ তার অনুসারী হয়ে যাবে। তারা বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, দাজ্জাল নিঃসন্দেহে কাফের; তবে তাঁর খাদ্যভাণ্ডার থেকে খেতে এবং তার বাগানে পশুপাল চড়াতে তার অনুসারী হয়েছি। পরবর্তী সময়ে যখন আল্লাহর গজব নাযিল হবে, তা তাদের সকলের উপর নাযিল হবে।[৪৪]

আজ মুসলমান এই হাদীছগুলোতে চিন্তা করে না। যদি আমরা চিন্তা করি, তা হলে গোটা সুরতহাল স্পষ্ট হয়ে যাবে। আজও কি এমনটি হচ্ছে না যে, বাতিলের পরিচয় জানা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মুসলমান বাতিলের সঙ্গ দিচ্ছে, বাতিলকে সহযোগিতা দিচ্ছে কিংবা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে?

হযরত শাহ্র ইবনে হাওশাব (রাযি.) আসমা বিনতে যায়ীদ আনসারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা (রাযি.) বলেছেন, (একদিন) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। তিনি বলেছেন, তার ফেতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনাটি এই হবে যে, সে এক গ্রাম্য লোকের নিকট আসবে এবং বলবে, তোমার খেয়াল কী; আমি যদি তোমার মৃত উষ্ট্রীটি জীবিত করে দেই, তা হলে কি

৪৪. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৬*

তুমি মেনে নেবে যে, আমি তোমার রব? গ্রাম্য লোকটি বলবে, হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারপর শয়তানরা তার মৃত উষ্ট্রীটিকে ঠিক আগের মতো বরং তার চেয়েও উত্তম – যেমন দুগ্ধদায়িনী ভরাপেট ছিল – বানিয়ে দেবে।

অনুরূপভাবে দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার পিতা ও ভাই মারা গেছে। তাকে বলবে, তোমার ধারণা কী; আমি যদি তোমার বাপ-ভাইকে জীবিত করে দেই, তারপরও কি তুমি মানবে না যে, তোমার রব আমি? উত্তরে সে বলবে, কেন নয়। ফলে শয়তানরা লোকটির পিতা ও ভাইয়ের আকৃতিতে এসে হাজির হবে।

এ-পর্যন্ত বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক কাজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন লোকেরা এ-ঘটনায় বিষণ্ণ ও বিচলিত ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার চৌকাঠদুটো ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, কী হয়েছে আসমা? উত্তরে আসমা (রাযি.) বললেন, দাজ্জালের আলোচনা করে আপনি আমাদের কলিজাটা বের করে দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ও যদি আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে আমি তার জন্য বাধা হয়ে যাব। অন্যথায় আমার রব প্রতিজন মুমিনের হেফাজতকারী হবেন। তারপর আসমা (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আটা খামির করি, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত রুটি তৈরি করি না, যতক্ষণ-না আমাদের ক্ষুধা লাগে। তো সে-সময় ঈমানদারদের অবস্থা কী হবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্য সেই তাসবীহ-তাহমীদই যথেষ্ট হবে, যা আকাশের অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে।[৪৫]

এই বর্ণনাটি ইমাম আহমদও বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় বর্ণনায় শব্দের কিছু তারতম্য আছে। তাতে অতিরিক্ত এই কথাটিও আছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা আমার মজলিসে উপস্থিত হয়েছ এবং আমার বক্তব্য শুনেছ, তোমরা এই কথাগুলোকে সেই লোকদেরও কানে পৌঁছিয়ে দিয়ো, যারা এই মজলিসে উপস্থিত নেই।'

মুসনাদে তায়ালিসিতে এই বর্ণনাটি শাহ্র ইবনে হাওশাব-এর সনদ ব্যতীত অন্য সনদে উল্লেখিত হয়েছে।

দাজ্জালের আলোচনা যে-সাহাবীই শুনেছেন, সকলেরই উপর চরম ভীতি ও আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছিল। এই আলোচনাটির চরিত্রই এমন যে, যে-ই শুনবে,

৪৫. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৫*

তারই লোম কাঁটা দিয়ে উঠবে। শিউরে ওঠার মতো আলোচনা এটি। কাজেই এ-বিষয়টিকে মানুষের মাঝে ব্যাপকহারে প্রচার করা দরকার।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) দাজ্জাল-বিষয়ক বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এ-বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করছি, যেন তোমরা বিষয়টিতে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা-গবেষণা কর, সজাগ-সচেতন হও, সে মোতাবেক কাজ কর এবং বিষয়টি তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আলোচনা কর। কারণ, দাজ্জালের ফেতনা ভয়াবহতম একটি ফেতনা।[৪৬]

দাজ্জালের বাহন ও তার গতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জালের গাধার (বাহনের) দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের দূরত্ব থাকবে এবং এক-একটি পদক্ষেপ তিন দিনের ভ্রমণের সমান (প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮২ কিলোমিটার। এভাবে তার গতি প্রতি ঘণ্টায় ২ লাখ ৯৫ হাজার ২ শত কিলোমিটার) হবে। সে তার গাধার পিঠে আরোহণ করে সমুদ্রে এমনভাবে ঢুকে যাবে, যেমন তোমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে পানির ছোট নালায় ঢুকে থাক (এবং নালা পার হয়ে থাক)। সে দাবি করবে, আমি সমগ্র বিশ্বজগতের রব এবং সূর্যটা আমার কথামতো চলছে। তোমরা কি চাচ্ছ যে, আমি একে থামিয়ে দিই? তার কথায় সূর্য থেমে যাবে। এমনকি একটি দিন মাস ও সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এবার সে বলবে, তোমরা কি চাচ্ছ, আমি এটিকে আবার চালিয়ে দিই? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ; দিন। তখন দিন ঘণ্টার সমান হয়ে যাবে।

তার কাছে এক মহিলা আসবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি আমার পুত্র ও স্বামীকে জীবিত করে দিন। তখন শয়তানরা মহিলার পুত্র ও স্বামীর আকৃতিতে এসে হাজির হবে। মহিলা শয়তানকে গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং তার সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। মানুষের ঘরগুলো শয়তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এক গ্রাম্যলোক দাজ্জালের নিকট আসবে এবং বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের উট ও বকরিগুলোকে জীবিত করে দিন। দাজ্জাল তাদেরকে উট-বকরির আকৃতিতে কতগুলো শয়তান দিয়ে দেবে। এই পশুগুলো ঠিক সেই বয়স ও সেই শরীর-স্বাস্থ্যের হবে, যেমনটি তাদের মৃত উট-বকরিগুলো ছিল। এসব দেখে গ্রামের অধিবাসীরা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন,

৪৬. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান*

তাহলে আমাদের মৃত উট-বকরিগুলোকে কোনোক্রমেই জীবিত করতে পারতেন না।

দাজ্জালের সঙ্গে ঝোল ও গোশ্‌তওয়ালা হাড়ের পাহাড় থাকবে, যেগুলো সব সময় গরম থাকবে – কখনও ঠাণ্ডা হবে না। আর প্রবহমান নহর থাকবে। একটি পাহাড় থাকবে বিভিন্ন ফল ও সবজির বাগানের। একটি পাহাড় থাকবে আগুন ও ধোঁয়ার। সে বলবে, এটি আমার জান্নাত আর এটি আমার জাহান্নাম। এগুলো আমার খাদ্য আর এগুলো আমার পানীয়। হযরত ঈসা (আ.) তার সঙ্গে থেকে লোকরেদকে সতর্ক করবেন যে, এই লোকটি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। আল্লাহ তাঁর উপর লা'নত বর্ষণ করুন। তোমরা তার কবল থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে অনেক তীব্র গতি দান করবেন। ফলে দাজ্জাল তাঁর নাগাল পাবে না।

তো দাজ্জাল যখন বলবে, আমি সমগ্র জগতের রব, তখন মানুষ বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বললেন, মানুষ সত্য বলেছে। তারপর ঈসা (আ.) মক্কার দিকে আসবেন। সেখানে তিনি বড় এক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দেবেন, আমি মিকাইল; দাজ্জালকে হারাম থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। তারপর হযরত ঈসা (আ.) মদীনার দিকে আসবেন। সেখানেও তিনি বড় এক ব্যক্তিত্বের দেখা পাবেন। জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কে? বলবেন, আমি জিবরাইল; দাজ্জালকে আল্লাহর রাসূলের হারাম থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।

এবার দাজ্জাল মক্কার দিকে অগ্রসর হবে। এসে যখন মিকাইল (আ.)-কে দেখবে, সঙ্গে-সঙ্গে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবে এবং পবিত্র হারামে ঢুকতে ব্যর্থ হবে। তবে সে বিকট শব্দে একটা চিৎকার দেবে, যার ফলে প্রতিজন মুনাফিক নারী ও মুনাফিক পুরুষ মক্কা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের কাছে চলে যাবে। তারপর দাজ্জাল মদীনার দিকে আসবে। কিন্তু যখন জিবরাইলকে দেখবে, সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সেখানেও সে সজোরে একটা চিৎকার দেবে। সেই চিৎকার শুনে প্রতিজন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মদীনা থেকে বেরিয়ে তার কাছে চলে যাবে।

এক তথ্য সরবরাহকারী মুসলমান (গোয়েন্দা বা দূত) মুসলমানদের এই দলটির নিকট আসবে, যারা কুস্তুন্তুনিয়া জয় করেছে এবং যাদের সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলমানদের সম্প্রীতি থাকবে। বলবে, অচীরেই দাজ্জাল তোমাদের কাছে এসে পৌঁছুবে। শুনে তারা বলবে, আসুক; আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকো। দূত বলবে, না, আমাকে অন্যদেরও সংবাদটা পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এই লোকটি যখন ফেরত রওনা হবে, তখন দাজ্জাল তাকে ধরে ফেলবে এবং বলবে, এই সেই লোক, যে মনে করে, আমি তাকে কাবু করতে

পারব না। নাও, একে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলো। এই মুসলিম দূতকে করাত দ্বারা চিড়ে ফেলা হবে।

তারপর দাজ্জাল (জনতাকে উদ্দেশ করে) বলবে, আমি যদি এই লোকটিকে তোমাদের সামনে জীবিত করে দেই, তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে, আমি তোমাদের রব? জনতা বলবে, আমরা তো আগে থেকেই জানি, আপনি আমাদের রব। তারপরও এই বিশ্বাসটিকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দাজ্জাল লোকটিকে জীবিত করে তুলবে। লোকটি আল্লাহর ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ এই লোকটি ব্যতীত আর কারও ক্ষেত্রে দাজ্জালকে এই শক্তি দেবেন না যে, কাউকে হত্যা করে সে আবার তাকে জীবিত করবে।

তারপর দাজ্জাল মুসলমান দূতকে বলবে, আমি কি তোমাকে হত্যা করে জীবিত করিনি? কাজেই আমি তোমার রব। উত্তরে দূত বলবে, এখন তো আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, আমি-ই সেই ব্যক্তি, যাকে নবীজি (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে এবং পরে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করবে। আর আল্লাহ আমাকে ব্যতীত আর কাউকে পুনরায় জীবিত করবেন না। তারপর উক্ত দূতের গায়ে তামার চাদর জড়িয়ে দেওয়া হবে, যার ফলে দাজ্জালের কোনো অস্ত্র তার উপর ক্রিয়া করবে না। না তরবারি, না ছুরি, না পাথর, না অন্য কোনো অস্ত্র। ফলে দাজ্জাল বলবে, একে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আল্লাহ দাজ্জালের আগুনের পর্বতটিকে সবুজ-শ্যামল বাগিচায় পরিণত করে দেবেন (কিন্তু দর্শকরা মনে করবে, ওকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে)। মানুষ সংশয়ে নিপতিত হবে।

তারপর দাজ্জাল দ্রুত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এগিয়ে যাবে। যখন সে আফীকের চূড়ায় আরোহণ করবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পতিত হবে। (ফলে মুসলমানরা তার আগমন টের পেয়ে যাবে) সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাদের ধনুকগুলোকে ঠিকঠাক করে নেবে। (সেই দিনটি এত কঠিন হবে যে), সেদিন সেই মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করা হবে, যারা ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে (বিশ্রামের লক্ষ্যে) সামান্য সময়ের জন্য থেমে যাবে বা বসে পড়বে। (অর্থাৎ যত শক্তিশালী যোদ্ধাই হোক, ঘোরতর যুদ্ধ লড়ার কারণে সামান্য সময়ের জন্য হলেও সে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হবে) এই অবস্থায় মুসলমানরা ঘোষণা শুনবে– 'লোকসকল, তোমাদের কাছে সাহায্য (হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম) এসে পড়েছে।'[৪৭]

দাজ্জালের এক-একটি পদক্ষেপ তিন দিনের সফরের সমান হবে। হিসাব করে পাওয়া গেছে, এই পরিমাণটা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮২ কিলোমিটার। ঘণ্টায়

৪৭. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪৩*

২ লাখ ৬৫ হাজার ২শো কিলোমিটার। হিসাবটা আমরা এভাবে বের করেছি যে, তিন দিনের শরয়ী সফর হলো ৪৮ মাইল। ৪৮ মাইলে ৮২ কিলোমিটার। এই হিসাবের অর্থ দাঁড়ায়, দাজ্জাল সেকেন্ডে ৮২ কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ রবে। মুসলিম শরীফে নাওয়াস ইবনে সাম'আন-এর বর্ণনায় দাজ্জালের গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যেন সেই বৃষ্টি, বায়ু যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

'আফীক' একটি পাহাড়ি সড়কের নাম, যেখানে জর্ডান নদী তাবরিয়া উপসাগর থেকে বের হয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল এই অঞ্চলটির দখল হাতে নিয়েছিল। 'আফীক'-এর আরেক নাম আছে 'এমটি পিটার্স'। বাইবেলের ভাষ্য মোতাবেক 'আফীক' সেই জায়গা, যেখানে হযরত ঈসা (আ.) ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্যাপ্টিজমের জন্য যেখানে বহু মানুষ গিয়ে থাকে।[৪৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اُذُنِ حِمَارِ الدَّجَّالِ تُظِلُّ سَبْعِيْنَ اَلْفًا

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের গাধার কানগুলো এত বড় হবে যে, সত্তর হাজার মানুষ তার তলে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে।[৪৯]

হযরত কা'ব (রাযি.) বর্ণনা করেন, দাজ্জাল যখন উর্দুনে (জর্ডানে) আসবে, তখন সে তূর পাহাড়, ছাওর পাহাড় ও জুদি পাহাড়কে ডাকবে। এমনকি এই তিনটি পাহাড় পরস্পর এমনভাবে সংঘাতে লিপ্ত হবে, যেমন দুটি ষাড় কিংবা ছাগল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।[৫০]

عَنْ نَهِيْكِ بْنِ صَرِيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمْ عَلٰى نَهْرِ الْاُرْدُنِ الدَّجَّالَ اَنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি (এই যুদ্ধে) তোমাদের বেঁচে-যাওয়া-সৈনিকরা উর্দুন (জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবে। (এই যুদ্ধে) তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।'[৫১]

এখানে মুশরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হিন্দুজাতি। তার মানে এটি সেই যুদ্ধ, যেখানে মুজাহিদরা হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ চালাবে এবং ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারয়াম-এর সাক্ষাত পাবে।

৪৮. *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা*
৪৯. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৮*
৫০. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৭*
৫১. *আল-ইসাবা ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭৬*

দাজ্জালের হত্যা ও মানবতার শত্রুদের নির্মূলকরণ

হযরত মুজাম্মা' ইবনে জারিয়া আনসারি (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'ঈসা ইবনে মারয়াম দাজ্জালকে 'লুদ্'-এর ফটকে হত্যা করবেন।'[৫২]

'লুদ্' তেলআবিব থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর। ১৯৯৯ সালের জরিপ অনুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ৬১ হাজার ১শো। ইসরাইল এই শহরে সর্বাধুনিক নিরাপত্তাসমৃদ্ধ বিমানবন্দর স্থাপন করেছে। হতে পারে, দাজ্জাল এখান থেকে বিমানযোগে পালানোর চেষ্টা করবে এবং এই বিমানবন্দরেই তাকে হত্যা করা হবে। মহান আল্লাহ তাঁর শত্রু ও ইহুদিদের খোদা দাজ্জালকে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আ.)-এর হাতে হত্যা করাবেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব বুঝতে পারে যে, মানবতার বিষফোঁড়াগুলোকে নির্মূল করতে হলে সেগুলোকে কেটে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলা জরুরি আর এই কাজটি জিহাদেরই মাধ্যমে হয়ে থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدُ مِن وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ الْيَهُوْدِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমানরা ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মুসলমানরা ইহুদিদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদিরা পাথর ও গাছের আড়ালে লুকোবে। তখন পাথর ও গাছ বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই যে আমার পেছনে এক ইহুদি লুকিয়ে আছে; তুমি এসে ওকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' বলবে না। কেননা, সেটি ইহুদিদের গাছ।'[৫৩]

ইহুদিদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ জড় পদার্থগুলোকেও বাক্‌শক্তি দান করবেন। তারাও ইহুদিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ইহুদিদের অনিষ্ট ও অনাচার শুধু মানবতারই জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং তার নাপাক কর্ম জড় পদার্থগুলোকেও প্রভাবিত করে থাকে। শিল্পবিপ্লবের নামে পরিবেশ ধ্বংস করে তারা বনের-পর-বন উজাড় করে দিয়েছে। আল্লাহর শত্রু এই জাতিটি যেভাবে বিশ্বকে যুদ্ধের অনলকুণ্ডে পরিণত করেছে, তার ক্রিয়ায় পৃথিবী অনু-পরমাণুও প্রভাবিত হয়েছে।

---

৫২. মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২০; সুনানে তিরমিযি ॥ হাদীছ নং ২২৪৪
৫৩. সুনানে মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৩৯

ইসরাইল যখন গোলান পর্বতমালায় দখল প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখন থেকেই তারা ওখানে 'গারকাদ' বৃক্ষ লাগাতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও তারা স্থানে-স্থানে এই গাছটি রোপণ করছে। সম্ভবত এই গাছের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

দাজ্জাল বিষয়ে হযরত হুযায়ফা বর্ণিত একটি সুবিস্তৃত হাদীছ

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন, 'যাওরায় যুদ্ধ হবে।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যাওরা কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'পূর্ব দিককার একটি শহর, যেটি কয়েকটি নদীর মধ্যখানে অবস্থিত। আল্লাহর সৃষ্টিকূলের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও আমার উম্মতের অত্যাচারী লোকেরা সেখানে বাস করে। তাদের উপর চার ধরনের শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে। অস্ত্রের শাস্তি (মানে যুদ্ধ), মাটিতে ধসে যাওয়ার শাস্তি, পাথরের শাস্তি ও আকৃতি বিকৃত হওয়ার শাস্তি।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন, যখন সুদানিরা বের হবে এবং আরবদেরকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবে, এমনকি আরবরা বাইতুল মুকাদ্দাস কিংবা উরদুন (জর্ডান) পৌঁছে যাবে, ঠিক এমন সময় সুফিয়ানি তিনশো ষাট অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমনকি সে দামেশ্‌ক চলে আসবে। তার কোনো একটি মাস এমন অতিবাহিত হবে না, যাতে বনু কাল্‌বের ত্রিশ হাজার মানুষ তার হাতে বায়'আত করবে।

সুফিয়ানি একটি বাহিনী ইরাক প্রেরণ করবে, যার ফলে যাওরায় এক লাখ মানুষ নিহত হবে। তার অব্যবহিত পর সে দ্রুতগতিতে কুফার দিকে অগ্রসর হবে এবং কুফাকে লুণ্ঠন করবে। এ-সময় পূর্বদিক থেকে একটি বাহন (দাব্বা) আত্মপ্রকাশ করবে, যাকে বনু তামীমের শু'আইব ইবনে সালিহ নামক এক ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে। এই লোকটি সুফিয়ানি বাহিনীর হাত থেকে কুফার বন্দিদের ছাড়িয়ে আনবে এবং সুফিয়ানির সৈন্যদেরকে হত্যা করবে।

সুফিয়ানি বাহিনীর একটি ইউনিট মদীনার দিকে এগিয়ে যাবে এবং সেখানে তিন দিন যাবত লুণ্ঠন চালাবে। তারপর এই বাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হবে। তারা যখন মক্কার আগে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ জিবরীলকে পাঠাবেন এবং বলবেন, জিবরীল, ওদের শাস্তি দাও। জিবরীল (আ.) তাঁর পা দ্বারা মাটিতে একটি আঘাত করবেন, যার ফলে আল্লাহ ওই বাহিনীটিকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন। দুই ব্যক্তি ব্যতীত তাদের একজন সৈনিকও প্রাণে রক্ষা পাবে না। এরা

দুজন সুফিয়ানির কাছে ফিরে আসবে এবং বাহিনীর মাটিতে ধসে ধ্বংস হওয়ার সংবাদ জানাবে। কিন্তু সুফিয়ানি সংবাদটা শুনে বিচলিত হবে না।

তারপর সুফিয়ানি কুস্তুন্তুনিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। তখন সে রোমান নেতাকে বার্তা প্রেরণ করবে, ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) আমার দিকে বড় মাঠে পাঠিয়ে দাও। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, সে (রোমান নেতা) তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সুফিয়ানির কাছে পাঠিয়ে দেবে। ফলে সুফিয়ানি দামেশ্কের ফটকে তাদেরকে ফাঁসি দেবে। তারপর পরিস্থিতি এই অবস্থায় উপনীত হবে যে, সুফিয়ানি এক মহিলাকে সঙ্গে করে দামেশ্কের মসজিদে-মসজিদে ঘুরে বেড়াবে। সে এক মসজিদের মেহরাবে উপবিষ্ট থাকবে। তখন উক্ত মহিলা তার উরুতে উঠে বসে পড়বে। তখন এক মুসলমান দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ জানাবে এবং বলবে, তোমার ধ্বংস হোক; ঈমান আনয়নের পর তুমি আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করছ? এ-কাজ তো বৈধ নয়। উত্তরে সুফিয়ানি দাঁড়িয়ে যাবে এবং মসজিদের মধ্যেই উক্ত মুসলমানের ঘাড় উড়িয়ে দেবে। সে প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে এ-বিষয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। (এ-ঘটনাগুলো ঘটবে হযরত মাহদির আত্মপ্রকাশের আগে) তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা দেবে, 'লোকসকল, মহান আল্লাহ অত্যাচারী মুনাফিক, তাদের জোটভুক্ত ও সমমনা লোকদের দিন শেষ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের উপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করেছেন। কাজেই মক্কা ফিরে গিয়ে তোমরা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও। তিনি হলেন মাহ্দি। তাঁর নাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, এবার ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এই সুফিয়ানিকে কীভাবে চিনব? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে নবী ইসরাইলের কিনানা গোত্রের সন্তান হবে। তার গায়ে দুটি কাতওয়ানি চাদর থাকবে। তার চেহারার রং ঝলমলে তারকার মতো হবে। ডান গালে তিলক থাকবে। আর বয়স চল্লিশের কম হবে। (মাহ্দির সঙ্গে বায়আতের জন্য শাম থেকে আবদাল ও) অলীগণ বেরিয়ে আসবে। মিসর থেকে (ধর্মীয় বিচারে) সম্মানিত ব্যক্তিরা এবং পূর্ব থেকে বিভিন্ন গোত্র আসবে। এমনকি তারা মক্কা পৌঁছে যাবে। তারা যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি এক স্থানে মাহ্দির হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। তারপর মাহ্দি শামের দিকে চলে যাবে। জিবরীল তার অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। মিকাইল থাকবে পশ্চাৎ বাহিনীর দায়িত্বে। আসমান ও জমিনের বাসিন্দারা, পশু-পাখি ও সমুদ্রের মাছেরা সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তার শাসনামলে পানির প্রাচুর্য হবে। নদী-সমুদ্র প্রশস্ত হয়ে যাবে। জমি তার উৎপাদনকে দ্বিগুণ করে দেবে এবং ধনভাণ্ডার বের করে দেবে। সে শাম আসবে

এবং সুফিয়ানিকে একটি গাছের নিচে হত্যা করবে, যার ডালপালাগুলো তাবরিয়া উপসাগরের দিকে। তারপর সে কাল্ব গোত্রকে হত্যা করবে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি কাল্ব যুদ্ধের দিন গনিমত থেকে বঞ্চিত থাকবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। চাই উটের একটি লাগামই ভাগে পাক-না কেন।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের (সুফিয়ানি বাহিনীর) সঙ্গে যুদ্ধ করা কীভাবে জায়েয হবে; তারা তো তাওহীদে বিশ্বাসী হবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'শোনো হুযায়ফা, সে-সময় সে মুরতাদ অবস্থায় থাকবে। সে বিশ্বাস করবে, মদ হালাল। সে নামায পড়বে না।'

মাহ্দি মুমিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হবে এবং দামেশ্ক পৌঁছে যাবে। তারপর মহান আল্লাহ এক রোমানকে (সৈন্যসহ) তার প্রতি প্রেরণ করবেন। এই লোকটি হেরাকল-এর (যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে রোমের রাজা ছিলেন) পঞ্চম প্রজন্মের লোক হবে। তার নাম হবে 'তার্‌রাহ'। সে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হবে। তোমরা সাত বছরের জন্য তার সঙ্গে সন্ধি করবে। কিন্তু রোমান এই সন্ধি শুরুতেই ভেঙে ফেলবে, যেমনটি পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং জয়যুক্ত হয়ে গনীমত অর্জন করবে। তারপর তোমরা সবুজ-শ্যামল উঁচু ভূমিতে আসবে। তখন এক রোমান উঠে আসবে এবং বলবে, ক্রুশ জয়ী হয়ে গেছে। (অর্থাৎ– এই জয় ক্রুশের কারণে হয়েছে) একথা শুনে এক মুসলমান ক্রুশের দিকে এগিয়ে যাবে এবং ক্রুশটিকে ভেঙে ফেলবে এবং বলবে, আল্লাহ-ই একমাত্র বিজয় দানকারী।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে-সময় রোমান প্রতারণার আশ্রয় নেবে এবং সে প্রতারণারই উপযুক্ত লোক হবে। ফলে মুসলমানদের সেই দলটি শহীদ হয়ে যাবে। তাদের একজনও প্রাণে রক্ষা পাবে না। তখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে তারা সন্তান গর্ভধারণের সময়কালের সমান সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। (পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর) তারা আটটি পতাকার তলে তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে। প্রতিটি পতাকার নিচে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে। এমনকি তারা আন্তাকিয়ার সন্নিকটে 'ওমক' নামক স্থানে পৌঁছে যাবে। হীরা ও শামের প্রতিজন খ্রিস্টান ক্রুশ উঁচু করবে এবং বলবে, 'শোনো, যতজন খ্রিস্টান পৃথিবীতে বিদ্যমান আছ, সবাই আজ খ্রিস্টবাদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমাদের নেতা এখন মুসলমানদের নিয়ে দামেশ্ক থেকে রওনা করবেন এবং ওমকে এসে পৌঁছুবেন। তারপর তিনি শামের অধিবাসীদের কাছে বার্তা পৌঁছাবেন, তোমরা আমাকে

সাহায্য করো। তিনি প্রাচ্যের লোকদের কাছে বার্তা পাঠাবেন, আমাদের কাছে এমন এক শত্রুবাহিনী এসেছে, যার সত্তরজন কমান্ডার আছে। তাদের আলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওমকে'র শহীদান ও দাজ্জালবিরোধী শহীদগণ আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ বলে বিবেচিত হবে। লোহায়-লোহায় সংঘাত বাঁধবে। এমনকি এক মুসলমান এক কাফেরকে লোহার শলাকা দ্বারা আঘাত করে তাকে দুই টুকরো করে ফেলবে। পরিধানে বর্ম থাকা সত্ত্বেও কাফের রেহাই পাবে না। তোমরা তাদের এমনভাবে গণহারে হত্যা করবে যে, ঘোড়া রক্তের মাঝে ডুবে যাবে। তখন আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হবেন। তোমরা তাদেরকে বর্শা ও তরবারির আঘাত হানবে এবং ফোরাতের কূল থেকে তাদের উপর খোরাসানি ধনুক দ্বারা তির ছুড়বে। বস্তুত তারা (খোরাসানিরা) উক্ত শত্রুবাহিনীর সঙ্গে চল্লিশ সকাল (চল্লিশ দিন) ঘোরতর যুদ্ধ করবে। তারপর মহান আল্লাহ পূর্বের লোকদেরকে সাহায্য দেবেন। কাফেরদের মধ্য থেকে ৯ লাখ ৯৯ হাজার লোক নিহত হবে।

তারপর ঘোষণাকারী প্রাচ্যে ঘোষণা দেবে, ওহে লোকসকল, তোমরা শামে ঢুকে পড়ো। কারণ, সেটি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল এবং তোমাদের নেতাও সেখানে অবস্থান করছেন। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, সেদিন মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হবে সেইসব বাহন, যেগুলোকে আরোহণ করে তারা শাম প্রবেশ করবে। আর সেইসব খচ্চর, যেগুলোতে চড়ে তারা রওনা হবে। তারা শাম পৌঁছে যাবে। তোমাদের ইমাম ইয়েমেনবাসীদের নিকট বার্তা পৌঁছাবেন, তোমরা আমাকে সাহায্য দাও। তখন সত্তর হাজার ইয়েমেন আদ্‌ন-এর তাগড়া উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে বদ্ধ তরবারিগুলো ঝুলিয়ে আসবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহর সাচ্চা বান্দা। না আমরা প্রতিদান-পুরস্কারের প্রত্যাশী, না জীবিকার সন্ধানে এসেছি। (বরং আমরা এসেছি শুধুই ইসলামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে) এমনকি তারা আন্তাকিয়ার ওমকে মাহ্‌দির নিকট চলে আসবে। তারা অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ লড়বে। এই যুদ্ধে ত্রিশ হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে।

কোনো রোমান এই ঘোষণা শুনতে পাবে না। তোমরা পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলবে। সে-সময় তোমরা আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেদিন না তোমরা ব্যভিচারী হবে, না গনিমতের সম্পদে খেয়ানতকারী হবে, না কেউ চোর হবে। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার থেকে কোনো-না-কোনো ভুল প্রকাশ পায়নি। শুধু ইয়াইয়া ইবনে যাকারিয়া এর ব্যতিক্রম। কারণ, তার থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পায়নি।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাওবা করার দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেন, যেমন সাবানের ব্যবহারে ময়লা কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। (যেমন–সেদিন তোমাদের কেউ যদি অতীতে কোনো পাপ করেও থাকে, তবু তাওবার মাধ্যমে সেও পবিত্র হয়ে যাবে। এভাবে তোমাদের মাঝে কোনো নাফরমানের অস্তিত্ব থাকবে না)।

রোমের অঞ্চলে তোমরা যে-দুর্গের পাশ দিয়েই পথ অতিক্রম করবে এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলবে, তার প্রাচীর গুড়িয়ে যাবে। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ কুস্তুন্তুনিয়া ও রোমকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। তারপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। ওখানে তোমরা ৪ লাখ কাফেরকে হত্যা করবে এবং ওখান থেকে সোনা ও মণি-মুক্তার বিরাট ভাণ্ডার বের করবে। তোমরা দারুল বালাতে (হোয়াইট হাউসে) অবস্থান করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ রাসূল, 'দারুল বালাত' কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'রাজমহল'। তারপর তোমরা ওখানে এক বছর অবস্থান করবে। ওখানে বহু মসজিদ নির্মাণ করবে। তারপর ওখান থেকে ফেরত রওনা হবে এবং একটি শহরে আসবে, যার নাম 'কাদাদমারিয়া'। তখনও তোমরা ধনভাণ্ডার বণ্টনে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় শুনবে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে, দাজ্জাল তোমাদের অনুপস্থিতিতে শাম রাজ্যে তোমাদের ঘরে-ঘরে ঢুকে পড়েছে। ফলে তোমরা ফিরে আসবে। কিন্তু এই সংবাদটি হবে গুজব ও ভিত্তিহীন।

তোমরা বায়সানের খেজুরের রশি আর লেবাননের পাহাড়ের কাঠ দ্বারা নৌকা তৈরি করবে। তারপর আক্কা (হাইফার সন্নিকটে ইসরাইলের উপকূলীয় শহর) নামক এক শহর থেকে এক হাজার নৌকায় আরোহণ করবে। এছাড়া উরদুনের (জর্ডান) তীর থেকেও পাঁচশো নৌকা রওনা হবে। সেদিন তোমাদের চারটি সৈন্যবাহিনী থাকবে। একটি পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানদের, একটি পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলমানদের। একটি শামের অধিবাসীদের, একটি হেজাযের অধিবাসীদের। সেদিন তোমরা এত ঐক্যবদ্ধ হবে, যেন তোমরা একই পিতার সন্তান। আল্লাহ তোমাদের অন্তরগুলো থেকে পারস্পরিক দ্বেষ ও শত্রুতা দূর করে দেবেন।

(জাহাজগুলোতে আরোহণ করে) তোমরা আক্কা থেকে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। বাতাসকে তোমাদের এমন অনুগত বানিয়ে দেওয়া হবে, যেমনটি সুলায়মান ইবনে দাউদের জন্য অনুগত বানানো হয়েছিল। এভাবে তোমরা রোম পৌঁছে যাবে। তোমরা যখন রোম নগরীর বাইরে ছাউনি স্থাপন করে অবস্থান গ্রহণ করবে, তখন বড় এক পাদরি – যে কিনা আসমানি কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে – তোমাদের কাছে আসবে (সম্ভবত ইনি হবেন ভ্যাটিকানের পোপ) সে জিজ্ঞেস

করবে, তোমাদের নেতা কোথায়? তাকে বলা হবে, এই তো ইনি। সে তোমাদের নেতার কাছে বসে পড়বে এবং তাকে মহান আল্লাহর পরিচয়, ফেরেশতাদের পরিচয়, জান্নাত-জাহান্নাম, নবী আদম ও অন্যান্য নবীদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে-করতে মূসা ও ঈসা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (তোমাদের আমীরের উত্তর শুনে) সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের দীন আল্লাহ ও নবীওয়ালা দীন। আল্লাহ এই দীন ব্যতীত অন্য কোনো দীনে সন্তুষ্ট নন।

পাদরি আরও জিজ্ঞেস করবে, জান্নাতিরা পানাহার করবে কি? তোমাদের নেতা উত্তর দেবে, হ্যাঁ। এই উত্তর শুনে পাদরি কিছু সময়ের জন্য সিজদায় পড়ে যাবে। তারপর বলবে, এ ছাড়া আমার আর কোনো দীন নেই এবং এটিই মূসার দীন। আল্লাহ এই দীনকেই মূসা ও ঈসার উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। তা ছাড়া তোমাদের নবীর পরিচয় আমাদের ইনজীলে বারকালীতে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি (নবী) লাল উষ্ট্রীওয়ালা হবেন এবং তোমরাই এই নগরীর অধিকারী হবে। যা হোক, এবার আমাকে অনুমতি দিন; আমি আমার লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিই। কারণ, শাস্তি তাদের মাথার উপর এসে পড়েছে।

পাদরি চলে যাবে এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে সজোরে চিৎকার দিয়ে বলবে, ওহে রোমের অধিবাসীরা, তোমাদের কাছে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-এর সন্তানরা এসেছে, তাওরাত ও ইনজীলে যাদের উল্লেখ রয়েছে। তাদের নবী লাল উষ্ট্রীওয়ালা ছিলেন। কাজেই তাদের দাওয়াতে তোমরা লাব্বাইক বলো এবং তাদের আনুগত্য মেনে নাও।

পাদরির এই ঘোষণায় নগরবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তারা পাদরির দিকে তেড়ে আসবে এবং তাকে হত্যা করে ফেলবে। তার অব্যবহিত পরই মহান আল্লাহ আকাশ থেকে এমন এক আগুন প্রেরণ করবেন, যা হবে লোহার স্তম্ভের মতো। এই আগুন শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপর মুসলমানদের নেতা দাঁড়িয়ে বলবেন, লোকসকল, পাদরিকে শহীদ করা হয়েছে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর বলেছেন, উক্ত পাদরি (শহীদ হওয়ার আগে) একা-ই একটি দলকে প্রেরণ করবে। তারপর মুসলমানরা চারটি তাকবীরধ্বনি তুলবে, যার ফলে নগরীর প্রাচীরগুলো ভেঙে যাবে। এই শহরটি নাম 'রোম' এইজন্য রাখা হয়েছে যে, এটি নাগরিকদের দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, যেমনটি আনার ফল দানায় পরিপূর্ণ থাকে। তারপর মুসলমানরা ৬ লাখ কাফেরকে হত্যা করবে এবং সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অলংকারাদি ও সিন্দুক বের করে আনবে। এই সিন্দুকে সাকীনা, বনী ইসরাইলের দস্তরখান ও মূসা (আ.)-এর লাঠি, (তাওরাতের) কতগুলো পাত, সুলাইমান (আ.)-এর মিম্বর ও মান্-এর দুটি থলে থাকবে, যেগুলো বনী ইসরাইলের উপর (সালওয়া-এর সঙ্গে) অবতীর্ণ হতো। এই মান্ দুধের চেয়েও বেশি শাদা হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, এই বস্তুগুলো ওখানে কীভাবে গেল? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বনী ইসরাইল যখন অবাধ্যতা করল এবং নবীদেরকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ বুখতেনচ্চরকে প্রেরণ করলেন। সে বাইতুল মুকাদ্দাসে সত্তর হাজার বনী ইসরাইলকে হত্যা করল। পরে মহান আল্লাহ তাদের উপর দয়াপরবশ হলেন এবং পারস্যরাজার অন্তরে এই ভাবনা ঢেলে দিলেন যে, তুমি ইসরাইলের কাছে যাও এবং বুখতেনচ্চর থেকে তাদের মুক্ত করো। পারস্যরাজা গেল, বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করল এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সেখানে আবাদ করল। এভাবে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার আনুগত্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে থাকল। কিন্তু তারপর তারা পুনরায় পূর্বের মতো আচরণ শুরু করে দিলো। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, 'তোমরা যদি পুনরায় পাপ কর, তাহলে আমি তোমাদের পুনরায় শাস্তি দেব।'

তারা পুনরায় আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলো। ফলে আল্লাহ তাদের উপর রোমরাজা তাইতাসকে লেলিয়ে দিলেন। তাইতাস তাদেরকে বন্দিতে পরিণত করল এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে (৭০ খ্রিস্টসন পূর্বে) সিন্দুক ও ধনভাণ্ডার ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মুসলমানরা এই ধনভাণ্ডারগুলোই পুনরুদ্ধার করবে এবং সেগুলোকে বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

তারপর মুসলমানরা ফেরত রওনা হবে এবং কাতে' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। এই শহরটি এমন একটি নদীর তীরে অবস্থিত, যাতে নৌযান চলাচল করে না। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেন তাতে নৌযান চলাচল করে না? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারণ, নদীতে গভীরতা নেই। আর এই যে তোমরা নদী-সমুদ্রে ঢেউ দেখতে পাচ্ছ, এগুলোকে মহান আল্লাহ মানুষের উপকারের কারণ বানিয়েছেন। নদী-সমুদ্রে গভীরতা থাকে। এই গভীরতার কারণেই তাতে নৌযান চলাচল করে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলে উঠলেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাওরাতে এই নগরীর বিবরণ এই বলা হয়েছে যে, তার দৈর্ঘ্য এক হাজার মাইল আর প্রস্থ পাঁচশো মাইল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শহরটির তিনশো ষাটটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজা দিয়ে এক লাখ যোদ্ধা বের হবে। মুসলমানরা ওখানে চারটি

তাকবীরধ্বনি তুলবে। তখন তার প্রাচীরগুলো ভেঙে পড়বে। এখানে মুসলমানরা ওখানকার সমুদয় সম্পদ গনিমত বানিয়ে নেবে। সেখানে তোমরা সাত বছর অবস্থান করবে।

তারপর তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাস ফির আসবে। তখন সংবাদ পাবে, ইস্‌ফাহানের ইহুদিয়া নামক স্থানে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। তার একটি চোখ এমন হবে, যেন তার উপর রক্ত জমে গেছে। অপরটি এমন হবে, যেন সেটি নেই-ই। সে শূন্যের মধ্যেই পাখিদের ধরে-ধরে খাবে। তার পক্ষ থেকে বিকট শব্দের তিনটি চিৎকার দেওয়া হবে, যা পূর্ব ও পশ্চিমের সবাই শুনতে পাবে। সে লেজকাটা গাধার (কিংবা এই ডিজাইনের বিমান বা অন্য কোনো আকাশযান) পিঠে সাওয়ার হবে, যার দুই কানের মধ্যকার দূরত্ব হবে ৪০ গজ। তার দুই কানের নিচে সত্তর হাজার মানুষ দাঁড়াতে পারবে। সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের পেছনে থাকবে, যাদের গায়ে তারজানি চাদর জড়ানো থাকবে। (তারজানি চাদরও তায়লাসানের মতো সবুজ চাদরকে বলা হয়) অনন্তর জুমার দিন ফজর নামাযের সময় যখন নামাযের ইকামত হয়ে যাবে, তখন যেইমাত্র মাহ্‌দি মুসল্লীদের পানে তাকাবেন, অমনি তিনি দেখতে পাবেন, ঈসা ইবনে মারয়াম আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। তার পরিধানে দুটি কাপড় থাকবে। (মাথার চুলগুলো এমন চমকদার হবে যে, মনে হবে) তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে।

একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তার কাছে যাই, তা হলে আমি তার সঙ্গে মু'আনাকা করব কি? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোনো আবু হুরায়রা, তার এই আগমন প্রথমবারের আগমনের মতো হবে না। তার সঙ্গে তুমি এমন প্রভাবদীপ্ত অবস্থায় মিলিত হবে, যেমনটি মৃত্যুর ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়। তিনি মানুষকে জান্নাতের মর্যাদা ও স্তরের সুসংবাদ প্রদান করবেন। এবার আমীরুল মুমিনীন তাকে বলবে, আপনি সামনে এগিয়ে আসুন এবং লোকদেরকে নামায পড়ান। উত্তরে ঈসা বলবে, নামাযের ইকামত আপনার জন্য হয়েছে। (কাজেই ইমামতও আপনিই করুন)। এভাবে ঈসা ইবনে মারয়াম তার পেছনে নামায আদায় করবে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন 'সেই উম্মত সফল হয়ে গেছে, যার শুরুতে আমি আর শেষে ঈসা।' তারপর বললেন, 'দাজ্জাল আসবে। তার কাছে পানির ভাণ্ডার ও ফলফলাদি থাকবে। সে আকাশকে আদেশ করবে, বর্ষিত হও। আকাশ বর্ষিতে শুরু করবে। মাটিকে আদেশ করবে, ফসল উৎপন্ন করো। মাটি ফসল উৎপন্ন করে দেবে। তার কাছে ছারীদের পাহাড় থাকবে। (এর অর্থ প্রস্তুত খাবার হতে পারে) যেমনটি আজ ডিবায় প্যাকিংকরা খাবার পাওয়া যায়) তাতে ঘি-এর কূপ থাকবে। তার একটি ফেতনা এই হবে যে,

সে এক গ্রাম্য ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, যার পিতামাতা মৃত্যুবরণ করেছে। সে লোকটিকে উদ্দেশ করে বলবে, আচ্ছা, আমি যদি তোমার পিতামাতাকে জীবিত তুলে দেই, তা হলে কি তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আমি রব? লোকটি বলবে, কেন বলব না?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এবার দাজ্জাল দুটি শয়তানকে বলবে, এর সামনে এর পিতামাতার আকৃতি উপস্থাপন করো। শয়তান তাদের আকৃতি পালটে ফেলবে। একটি লোকটির পিতার আকৃতি ধারণ করবে, একটি মায়ের। তারা বলবে, ওহে পুত্র, তুমি এর সঙ্গী হয়ে যাও। ইনিই তোমাদের রব।

দাজ্জাল মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। তারপর ঈসা ইবনে মারয়াম তাকে ফিলিস্তিনের লুদ্ নামক শহরে হত্যা করবে। (বর্তমানে লুদ্ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত)।[৫৪]

এই বর্ণনাটি এখানেই শেষ নয়, এর আরও অংশ অবশিষ্ট আছে। ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্তকার সমস্ত আলামত তাতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু দাজ্জাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাই বর্ণনাটি এতটুকু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

এই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি যদিও একত্রিতভাবে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তবে এর বিভিন্ন অংশ আবু নু'আঈম ইবনে হাম্মাদ আলাফিতান-এ উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনাটির কিছু অংশ সহীহ, কিছু যয়ীফ আর কিছু মুনকার।

এই হাদীছে 'যাওরা'য় যুদ্ধ হবে বলা হয়েছে। অভিধানে লেখা আছে, 'যাওরা' বাগদাদের অপর নাম। এই অঞ্চলটি দুটি নদীর (দজলা ফোরাত) মধ্যখানে অবস্থিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটি সেই সমস্ত অঞ্চল, যা বর্তমানে তুরস্ক থেকে নিয়ে সিরিয়া হয়ে বসরা পর্যন্ত চলে গেছে। অর্থাৎ- ফোরাত ও দজলার মধ্যবর্তী সবটুকু অঞ্চল, যাকে ইংরেজিতে 'মিস্‌পোটিমিয়া' বলা হয়। 'মিস্‌পোটিমিয়া' মূলত গ্রীক শব্দ, যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। ইরাককেও এ-কারণেই মিস্‌পোটিমিয়া বলা হয় যে, দজলা ও ফোরাতের অধিকাংশ ইরাক হয়েই অতিক্রম করে থাকে। (এনসাইক্লপিডিয়া অব ব্রিটানিকা)

হাদীছে পূর্ব থেকে একটি 'দাব্বা' আত্মপ্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। আমরা শব্দটির অর্থ করেছি 'বাহন'। বনু তামীমের শু'আইব ইবনে মালীহ নামক এক ব্যক্তি বাহনটি চালাবে। হতে পারে, এটি খোরাসান থেকে আগত বাহিনীর একটি অংশ।

আ'মাক যুদ্ধের সময় হযরত মাহ্‌দির কাছে তিন জায়গা থেকে সাহায্য আসবে। শাম থেকে, পূর্বাঞ্চল, তথা খোরাসান থেকে ও ইয়েমেন থেকে। অথচ

---

৫৪. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১১০

এই তিন অঞ্চল ছাড়াও তো আরও কত মুসলিম রাষ্ট্র আছে। কিন্তু আপনি চিন্তা করলে দেখবেন যে, হযরত মাহ্‌দির সাহায্য সেই স্থানগুলোতে থেকেই আসবে, যেসব স্থানে বর্তমানেও মুজাহিদরা আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যাপৃত।

এই বর্ণনায় রোমানদের সঙ্গে সন্ধি ভেঙে যাওয়ার পর ওমকে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এই 'ওমক' দ্বারা 'আ'মাক'ই উদ্দেশ্য। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কাফেরদের উপর সেই খোরাসানি ধনুকের সাহায্যে তির বর্ষণ করাবেন, যেটি ফোরাতের কূলে স্থাপিত থাকবে। আপনি যদি মানচিত্র দেখেন, তা হলে দেখতে পাবেন, আ'মাক থেকে ফোরাত নদীর নিকটতম উপকূল আসাদ উপসাগর। আর এখান থেকে আ'মাকের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খোরাসান থেকে আগত কামানগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য তোপ কিংবা মর্টার। আর এরা সেই খোরাসানি বাহিনী, যাদের ব্যাপারে ফোরাতের তীরে যুদ্ধ করার কথা উল্লেখ আছে।

এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, রোম জয়ের জন্য নৌপথে জিহাদ পরিচালনা করা হবে।

যে-শহরে রোমের প্রধান ধর্মযাজক অবস্থান করে থাকেন, মুজাহিদগণ সেটি জয় করার পর কাতে' শহরটি জয় করবে এবং সেখানে তারা সাত বছর অবস্থান করবে। অর্থাৎ– ছয় বছর থাকার পর সপ্তম বছর দাজ্জালের আগমন ঘটবে।

দাজ্জালের ধোঁকা ও প্রতারণা

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ধোঁকা-প্রতারণা হবে বহুমুখী। মিথ্যাচার, প্রতারণা, গুজব ও প্রোপাগাণ্ডা এত বেশি হবে যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে যে, লোকটি মাসীহ, না দাজ্জাল?

সাধারণত মানুষের ধারণা হলো, দাজ্জাল শুধু কুৎসিত একটা চেহারা নিয়ে জগতে আত্মপ্রকাশ করবে। বিষয়টি যদি এতটা সহজ হতো, তা হলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ ছিল না। সত্য হলো, কুৎসিত মুখাবয়ব সত্ত্বেও তার কর্মকাণ্ড বিশ্বের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যে, মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়ে পড়বে, যদি এই লোকটি দাজ্জাল হতো, তা হলে এমন ভালো কাজ কক্ষনো করত না। জগতে আবির্ভূত হয়ে সে এত অধিক পরিমাণ ফেতনা জন্ম দেবে, যার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে বিভিন্ন হাদীছের আলোকে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করছি যে, দাজ্জালের কর্মপদ্ধতি কোন ধরনের হতে পারে।

১. দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের বছরগুলোতে পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও গণহত্যা চলতে থাকবে। বেকারত্ব, নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য ও সামাজিক অবিচারের রাজত্ব চলবে। পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সর্বত্র পাপ ও মন্দের জয়জয়কার হবে। কোথাও-কোথাও কিছু সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র চোখে

পড়বে। মানুষ এমন লোকেরও প্রশংসা করবে, যে ৯৯ ভাগ পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত; মাত্র ১ ভাগ সৎ কাজ করছে। নেতাদের থেকে নিরাশ হয়ে মানুষ এমন কোনো মুক্তিদাতার সন্ধানে থাকবে, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হবে।

২. এবার দাজ্জালের চেলারা মিডিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে এক নেতাকে মানবতার মুক্তিদাতা বানিয়ে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করবে এবং প্রমাণ করবে যে, ইনি বেকারদের কর্মসংস্থান দিয়েছেন, দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চলগুলোতে পানাহারের উপকরণ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাঝে চলমান বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের পথে তুলে দিয়েছেন, পৃথিবী থেকে অপরাধপ্রবণ লোকদের নির্মূল করেছেন, ঘরে-ঘরে ন্যায়বিচার পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে এখন পৃথিবীর সকল জাতিকে এক চোখে দেখা হচ্ছে। এভাবে সে নিজেকে খোদা দাবি করার আগে বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহমর্মিতা অর্জন করে নেবে। বলাবাহুল্য, এই যুগে যদি কোনো ব্যক্তি এতগুলো মহৎকর্ম আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়, তা হলে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় আস্থাশীল বিশ্ব তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে বাধ্য হবে। এভাবে মানুষের সমর্থন ও সহমর্মিতা তার সঙ্গী হয়ে যাবে।

৩. তারপর দাজ্জাল সর্বপ্রথম মানুষের মন-মস্তিষ্কে এই বুঝ ঢুকিয়ে দেবে যে, এসব আমি নিজের পক্ষ থেকে করছি না; বরং এসব কাজ করার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।

অর্থাৎ– সে নবুওতের দাবি করবে।

মাহ্‌দিবিরোধী সম্ভাব্য ইবলিসি চক্রান্তসমূহ

এটি ইবলিসের পুরনো রীতি যে, সে সত্যকে সংশয়যুক্ত বানানোর লক্ষ্যে নিজের তৈরী এজেন্টদেরকে সত্যের দাবিসহ মাঠে নামিয়ে দেয় এবং সত্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেষ্টা চালায়। ইবলিসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এই হবে যে, হযরত মাহ্‌দির আগমনের আগে সে একাধিক নকল মাহ্‌দি দাঁড় করিয়ে দেবে, যাতে কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সত্য থেকে দূরে সরে যায় এবং যখন আসল মাহ্‌দির আগমন ঘটবে, তখন মানুষ আপনা থেকেই সংশয়ের শিকার হয়ে পড়বে যে, কে বলবে, ইনি আসল মাহ্‌দি, না ভুয়া মাহ্‌দি। 'বিভ্রান্তকারী নেতৃবৃন্দ বিষয়ক' হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ-ক্ষেত্রে ইবলিসের প্রচেষ্টাসমূহ অনেকটা এ-রকম হতে পারে :

১. মিথ্যা মাহ্‌দির দাবিদারদের দাঁড় করাবে। তাদের মাঝে হযরত মাহ্‌দির গুণাবলি আছে বলে প্রচার করে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া হবে। এই ভুয়া মাহ্‌দির দাবিদার একাধিক হবে। আর একথা বলার অবকাশ থাকে না যে, এই মাহ্‌দিদেরকে অপার বিদ্যা, সুদর্শন আকার-গঠন ও একদল ভক্ত-মুরীদসহ

জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং বড়-বড় জুব্বা-কাবাওয়ালা মানুষ এই মিথ্যা মাহ্দিদেরকে আসল মাহ্দি বলে প্রমাণিত করতে সচেষ্ট হবে।

২. ইবলিসি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এই হতে পারে যে, তারা আসল মাহ্দির অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের এজেন্ট ও প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা চালাবে। এর জন্য তারা প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সেবা গ্রহণের চেষ্টা চালাবে, যেমনটি এ-যুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বিষয়টি সহজে বুঝবার জন্য আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

যেকোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কিছু সমর্থক-সহযোগী থাকে, আবার কিছু বিরুদ্ধবাদীও থাকে। আপনি যেকোনো মতাদর্শের নেতাকে দেখুন, দেখবেন, কিছুলোক তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ আবার কিছু মানুষ তার ঘোর সমালোচক। এমনকি তাকে কাফেরদের এজেন্ট আখ্যায়িত করার লোকেরও অভাব হবে না। প্রত্যেক মতাদর্শের লোকেরা আপন-আপন নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। কেউ যদি তার নেতাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তির আজকাল খুব নামডাক শোনা যাচ্ছে। শুনেছি, তিনি অনেক বড় একজন আল্লাহর অলী। অনেক ত্যাগী আলেম। তো হযরত, তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তার ব্যাপারে এই হযরত যে-অভিমত ব্যক্ত করবেন, তার পুরো অঙ্গনে সেই অভিমতই অনুসৃত হবে। হযরত যদি বলে দেন, সরকারের লোক; তার থেকে দূরে থাকো, তাহলে দেখবেন, লোকটি যুগের আবদালই হোক-না কেন, ফেরেশতারা তার চলার পথে পালক বিছিয়ে দিক-না কেন, হযরতের ফতোয়ার পর তার গোটা ভক্তমহল তাকে 'সরকারের দালাল' বলে আখ্যায়িত করবে।

এটি এমন এক ব্যাধি, যাতে সমাজের সেই শ্রেণীটি বেশি আক্রান্ত, যার প্রতিজনের হাতে সত্যের পতাকা রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, প্রতিজন সদস্যের পতাকা একজনেরটি অপরজনের থেকে ভিন্ন। তা ছাড়া একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের দাবি, আমার পতাকা-ই সত্যের পতাকা।

আহ, তারা যদি নিজ-নিজ আমিত্বের পতাকাগুলোকে অবনমিত করে ফেলত, তা হলে আল্লাহর কসম, সত্যের পতাকা তাদেরই হাতে বিশ্বময় পত্‌পত্ করে উড়ত। হায়, যদি তারা আপন মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনার সীমাবদ্ধ সীমান্তগুলোকে অসীম করে ফেলত; তা হলে আজ জল ও স্থল, মরু ও মহাশূন্য সব তাদের ধ্বনিতে মুখরিত থাকত। যদি তারা একজন অপরজনের বিরুদ্ধে দালালির ফতোয়া আরোপের পরিবর্তে ইসলামের শত্রুদের প্রতি মনোনিবেশ করত, তা হলে শুধু তাদেরই সারি থেকে কেন, সকল ক্ষেত্র থেকে শত্রুর এজেন্টরা নির্মূল হয়ে যেত। দাজ্জালের এসব ভয়াবহ ধোঁকা ও প্রতারণার কথা ভেবে

মুমিনজননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বগণও কেঁদে উঠতেন। মহানবীর সাহাবাগণও ক্রন্দন করতেন।

এ ছিল তাদের পরকালের ভয়। অন্যথায় তাঁদের মতো ব্যক্তিত্বদের সমস্যার কিছু ছিল না। যেলোকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত, নূরে এলাহি দ্বারা যাকে পথ দেখানো হয়ে থাকে, তার আবার ভাবনা কিসের। চিন্তা তো থাকা দরকার গুনাহগারদের। কিন্তু আফসোস! আমরা কখনও ভেবে দেখার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করি না। আর এমনভাবে নিশ্চিন্তমনে জীবন অতিবাহিত করছি, যেন কোনো ফেতনা-ই নেই।

দাজ্জালের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি

দাজ্জাল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা হবে, যার মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে যাচাই করা হবে, তারা আল্লাহর ওয়াদার উপর কতটুকু বিশ্বাস রাখে। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য আল্লাহ অনেক মর্যাদা ও প্রতিদান বরাদ্দ রেখেছেন। এ-কারণেই দাজ্জালকে সব ধরনের উপকরণ প্রদান করা হবে। শয়তানি উপকরণ থেকে নিয়ে সব ধরনের মানবীয় ও জাগতিক উপকরণ তার হাতে থাকবে।

আমরা যদি আধুনিক যুগের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নেপথ্য রহস্য উদ্‌ঘাটন করি, তা হলে এ-বিষয়টি অতি সহজেই বুঝতে সক্ষম হব যে, এসব প্রচেষ্টা সেই ইবলিসি মিশনকে বাস্তবায়িত করারই লক্ষ্যে আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। এখানে আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা ও প্রস্তুতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করছি, যাতে পরিস্থিতির কিছুটা ধারণা নেওয়া যায়।

দাজ্জাল ও খাদ্য উপকরণ

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, তার কাছে বিপুল পরিমাণ খাদ্য-উপকরণ থাকবে। সে যাকে ইচ্ছা খাদ্য দেবে, যাকে খুশি না খাইয়ে মারবে। বর্তমান পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী সবচে বড় কোম্পানিটির নাম 'নেস্‌লে'। এই প্রতিষ্ঠানটি ইহুদিদের মালিকানা এবং তার মিশন সমগ্র পৃথিবীর খাদ্য-উপকরণকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নেওয়া।

এই কোম্পানিটি বর্তমানে খাদ্য-উপকরণ, পানীয়, চকোলেট, সব ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য, কফি, গুঁড়োদুধ, শিশুদের দুধ, পানি, আইসক্রিম, সব ধরনের খাবার, আচার ও স্যুপ ইত্যাদি খাদ্য-পানীয় জাতীয় এমন কোনো আইটেম নেই, যা সে তৈরি করছে না। আর এই বস্তুবাদী জগত খাদ্য-পানীয়র বেলায় নেস্‌লের উপর নির্ভরশীল।

দাজ্জালের মোকাবেলায় কৃষক সমাজ

যারা দাজ্জালের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে যাবে। ফলে তাদের ফসলের ক্ষেতগুলো সব শুকিয়ে যাবে। এযুগে কৃষকসমাজ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বিষয়টিতে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি শব্দের মর্ম বুঝে নিন।

শব্দটি হলো 'পেটেন্ট', যার অর্থ 'আবিষ্কৃত দ্রব্য তৈরি বা বিক্রয়ের একক অধিকার'। এটি একটি আইন, যা মালিকের মালিকানা স্বত্বকে প্রমাণিত করে। এটি নতুন এক আন্তর্জাতিক কৃষিনীতি, যাকে কৃষক সমাজের উন্নতি ও স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে বিপ্লব নাম দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নীতি কৃষকের হাত থেকে উৎপাদিত শষ্যের এক-একটি দানা কেড়ে নেওয়ার গভীর এক চক্রান্ত।

ইহুদি কোম্পানিগুলো যদি কোনো শস্যবীজকে পেটেন্ট করে নেয়, তা হলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে এটির মালিক হয়ে গেছে। যেমন– তারা যদি কোনো একটি নাম দিয়ে পাকিস্তানি বাসমতি চালকে পেটেন্ট করে নেয়, তা হলে আমাদের প্রতিজন কৃষক বাসমতির বীজ উক্ত কোম্পানির নিকট থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি তারা নিজেরা বীজ উৎপাদন করে, তা হলে এই অপরাধের দায়ে তাদেরকে জরিমানা আদায় করতে ও জেলের বাতাস খেতে হবে। যেহেতু এই বীজ কৃত্রিম উপায়ে জেনেটিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, তাই এই বীজ এক বছরই ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম। পরবর্তী বছর যদি পুনরায় বাসমতির চাষ করতে হয়, তা হলে নতুন বীজ ক্রয় করতে হবে। সেই সঙ্গে ফসলের রোগ-বালাই দমনে ওই কোম্পানির ওষুধই কাজ করবে। অন্য কোনো কোম্পানির ওষুধ স্প্রে করলে ফসল ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানেই শেষ নয় – এই বীজ থেকে উৎপাদিত ফসল খাদ্য-পুষ্টির পরিবর্তে রোগ-ব্যাধির জনক হবে। এ-কারণেই দুর্ভিক্ষকবলিত আফ্রিকান দেশগুলো এই বীজ থেকে উৎপাদিত মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট এমনও বলেছেন, 'জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমাদেরকে এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমরা বিষাক্ত খাদ্য খাওয়ার উপর না খেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে প্রাধান্য দেব।'

এই আইনটি দেখতে খুবই সরল মনে হয়। কিন্তু বিষয়টি 'যার লাঠি তার মহিষ' ধরনের। এই আইনের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ইহুদি কোম্পানিগুলো বিশ্ববাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার পর এবার পৃথিবীর উৎপাদিত শস্যের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই আইন তৈরি করেছে, যাতে কাল যদি কেউ তাদের কথা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে তাকে খাদ্যের প্রতিটি কণার জন্য মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া যায়।

পেটেন্ট বিলের মাধ্যমে এভাবে ধীরে-ধীরে তারা আমাদের উৎপাদিত শস্যের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা সমগ্র পৃথিবীর শস্যের উপর পুরোপুরি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝবার জন্য আপনি নতুন কৃষিনীতি অধ্যয়ন করুন কিংবা কৃষকদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে ধীরে-ধীরে খাদ্য-উৎপাদন গম-চাউল ইত্যাদির চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করে এগুলোর উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এটা দুঃখজনক ঘটনা নয় কি যে, পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও গম-চিনি আমদানি করতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কেন? কয়েক বছর যাবত দেশটিতে গম ইত্যাদির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাচ্ছে না, যার ফলে প্রতিবছর পাকিস্তানকে লাখ-লাখ টন গম আমদানি করতে হচ্ছে। আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি না যে, এসব কার কথায় করা হচ্ছে? আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের কথায়? কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা তো বলছেন, তারা আমাদের খুব হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাদের ঘরে-ঘরে গিয়ে তারা আমাদের শিশুদেরকে পোলিও টিকা খাওয়াচ্ছে। কিন্তু তারা আমাদেরকে দুর্ভিক্ষকবলিত বানাতে চাচ্ছেন কেন?

খাদ্য-উৎপাদনকে নিজেদের মুঠোয় নেওয়া ছাড়াও ইহুদিদের আও একটি ধ্বংসাত্মক মিশন হলো, তারা জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে যেকোনো ফসল ধ্বংস করে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে। ইতিমধ্যে কিছু জীবাণু অস্ত্র তৈরিও করেছে।

যেসব লোক দাজ্জালের কথা মেনে নেবে, তাদের ফসলাদি সবুজ-সতেজ হয়ে উঠবে। কিংবা লেজার রশ্মির মাধ্যমে অনুর্বর জমিকে উর্বর বানিয়ে দেবে, যাতে সবুজ-সতেজ ফসল উৎপন্ন হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সেসব অবশ্যই পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হবে। বাহ্যিক পরিস্থিতি এখনই তার অনুকুল হোক আর না হোক। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিস্থিতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের অনুকূল হতে চলেছে। কাজেই এখনও সেসব ভয়াবহতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে উদাসীন থাকা বিবেক ও দীনদারির পরিচয় নয়।

দাজ্জালের কাছে গরম গোশ্তের পাহাড় থাকবে

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ সংকলিত 'আলফিতানে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে, 'দাজ্জালের সঙ্গে ঝোল ও এমন গরম গোশতের পাহাড় থাকবে, যা কখনও ঠাণ্ডা হবে না।'

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে নানা স্তর অতিক্রম করে খাদ্য ও পানীয় নিরাপদ রাখার জন্য স্বতন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 'ফুড প্রসেসিং ও ফ্রিজাইশন' নামে ১৮০৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এই

প্রতিষ্ঠানের কাজই হলো খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করা বিষয়ে গবেষণা করা। এ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি এ-যাবত বহুসংখ্যক পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেই পদ্ধতিগুলোর কিছু পদ্ধতি এমন, যেগুলোতে খাদ্যকে এক বিশেষ মাত্রার তাপে গরম রেখে সংরক্ষণ করা হয়। স্যুপ, আচার, সবজি, গোশ্ত, মাছ ও ডেইরিসংক্রান্ত বস্তুসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গোশ্তগুলো গরম হবে এবং সেগুলো ঠাণ্ডা হবে না' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O)

ডাক্তারি একটি অতিশয় সম্মানজনক পেশা। কিন্তু এই পেশার দৃষ্টান্ত হলো তরবারির মতো। তরবারি যদি আল্লাহভক্ত মানুষের হাতে থাকে, তা হলে সমগ্র মানবতার জন্য রহমতের কাজ দেয় এবং মানবতাকে সমস্ত ক্ষতিকর ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই তরবারি যদি ধর্মহীন ও আল্লাহর শত্রুর হাতে চলে যায়, তা হলে মানবতার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। ডাক্তারি পেশাটিও আজ ঠিক অনুরূপ হয়ে গেছে।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র বক্তব্যকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ অহী যে, এই সংস্থাটির কোনো কথা ভুল হতেই পারে না। কিন্তু আপনি কি জানেন, **W.H.O** আসলে কী? এর হর্তা-কর্তা কারা? এর ফাণ্ড কারা জোগান দেয়? এর মূল লক্ষ্য মানবতার সেবা, না অন্যকিছু?

এখানে আমরা শুধু এটুকু বলব যে, এই সংস্থাটি শতভাগ ইহুদি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হলো এমনসব বস্তু আবিষ্কার করা, যেগুলো ইবলিসি মিশন বাস্তবায়নে ইহুদিদের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়। চাই তা বিনাশমূলক হোক কিংবা গঠনমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করব যে, **W.H.O** ইহুদি স্বার্থের পক্ষে কীভাবে পথ সুগম করছে।

প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য আল্লাহপাক মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি ভূখণ্ডে সেখানকার মানুষের মেজাজ, মওসুম ও ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে নানা প্রকার ফলমূল ও শাকসবজি উৎপন্ন করেন। এ-সকল বস্তুসামগ্রী সেই দেশের নাগরিকদের মালিকানা ছিল। নিজেদের ক্ষুধা নিবারণে তারা কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা ছিল না। নিজেদের উৎপদিত ফসল নিজেরাই ভোগ করত। কিন্তু আল্লাহর শত্রু ইহুদি গোষ্ঠীর বিষয়টি সহ্য হলো না। তারা এসব উৎপাদনকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। ঠিক এমন, যেন **এই**

গোষ্ঠীটি আল্লাহর অবতারিত মান্ ও সাল্ওয়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট সবজি ও ডালের আবেদন জানিয়েছিল, যাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের দুষ্ট স্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

এর জন্য তারা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মাধ্যমে এমন আদেশ জারি করিয়ে নিল, যার আওতায় প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার ফলে বিশ্ব ধীরে-ধীরে প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী থেকে দূরে চলে গেছে এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যেসব খাদ্য-পানীয় সামগ্রী প্রস্তুত করছে, সেগুলোতে সাধারণত নষ্ট ও মানহীন উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেলায় তো তারা কোনোই আইনের ধার ধারে না।

১৯৯৭ সালে সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হেডসন ফুড কোম্পানির বিরুদ্ধে জীবাণু সংক্রমিত গোশ্ত সরবরাহের অভিযোগ আরোপ করে প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। তারপর সরকার আমেরিকাসহ সব কটি পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে গোশ্ত আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। (ডন, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪)

ইহুদি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো স্টিলের কারখানা তৈরি করে তার দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে চাইল। এই পণ্যটির জন্য তারা বাজারের সন্ধানে নেমে পড়ল। এখানে তারা তাদের উৎপাদিত এই পণ্যটি বিক্রি করবে। এর জন্যও তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সেবা গ্রহণ করল। তারা তথ্য প্রকাশ করল, মাটির পাত্রে খাবার খাওয়া ক্ষতিকর। আর যায় কোথায়! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল লোকগুলো তাদের এই তথ্যটি মেনে নেওয়া ফরজ মনে করল। কেউ চিন্তা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না, এর পেছনে আসল রহস্যটা কী?

এভাবে তারা মানুষের ঘর থেকে মাটির থালা-বাসন-পত্রের ব্যবহার তুলে দিল। কিন্তু মজার বিষয় হলো, মাটির যে-বরতনগুলোকে ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে পরিত্যাজ্য ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘর থেকে বের করে দিলো, সেই মাটির বাসন ফাইভস্টার হোস্টেলে পৌঁছে গেল এবং বলা হলো, এগুলোতে খাওয়ার মজাই আলাদা।

মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু পশ্চিমা মিডিয়ার বিষাক্ত প্রভাবে চরমভাবে প্রভাবিত, তাই পশ্চিমারা যা বলে, কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মানুষ তা-ই মেনে নেয়। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ওহে মুসলমান, তোমরা নিজেদের যে-বিবেককে বিবিসি, ভোয়া ও সিএনএন-এর কাছে বন্ধক রেখেছ,

তাকে ওদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনো। অন্যথায় তোমার বিবেককেও তারা একদিন টিনপ্যাক করে গায়ে নেস্‌লের লেবেল এঁটে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দেবে।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' দাজ্জালের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পথ সুগম করেছে। হাদীছে আছে, যদি কারও উট মরে যায়, তখন দাজ্জাল তার মৃত উটটির মতো একটি উট তৈরি করে দেবে। এই ঘটনাটিকে সে এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখাবে। এটি জাদুর মাধ্যমেও হতে পারে, জেনেটিক ক্লোনিং-এর মাধ্যমেও হতে পারে।

যদিও হাদীছে একথার উল্লেখ আছে যে, দাজ্জালের আদেশে শয়তান গ্রাম্য লোকটির পিতামাতার আকৃতিতে এসে হাজির হবে, তথাপি এ বক্তব্যের কারণে জেনেটিক ক্লোনিং পদ্ধতির প্রয়োগকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ, কুরআন ও হাদীছে 'শয়তান' শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

'অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু স্থির করেছি – মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান।'[৫৫]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবুযর, তুমি মানুষ ও জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ কি? উত্তরে আবুযর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান কি মানুষদের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ: মানুষ শয়তানের অনিষ্টতা জিন শয়তানের চেয়ে বেশি হয়।

পাশ্চাত্যের গবেষণাগারগুলোতে মানবক্লোনিং বিষয়ে নানা রকম গবেষণা চলছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক গবেষণাটি হলো এমন একটি মানুষ তৈরি করা, যেটি শক্তিতে অপরাজেয় এবং মেধায় অদ্বিতীয় প্রমাণিত হবে। এ-ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করছে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক', যার কাজই হলো প্রাণী নিয়ে গবেষণা করা। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাহ্যদৃষ্টিতে যেমন দেখা যায়, আসলে এটি তেমন নয়। এর মূল লক্ষ্য জেনেটিক মানুষ ও নতুন এক ধরনের সৃষ্টি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানো। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর যাবতীয় ব্যয় ইহুদিরা বহন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথামতো এবং তাদের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানববংশ ধ্বংসের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। সকলের চোখের সামনে তাদের হাতে মুসলমানদের বংশধারাকে

৫৫. সূরা আন'আম ॥ আয়াত : ১১২

ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের মা, বোন ও কন্যাদের কোলগুলোকে শূন্য করে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও মুসলিম জাতি জেনে-বুঝে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

ইহুদিদের চিন্তা-চেতনা অনুপাতে তাদেরই অর্থায়নে মুসলিম দেশগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পরিবার-পরিকল্পনা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যভিচার ও অশ্লীলতার পথের সব কটি প্রতিবন্ধক অপসারিত করা। ওহে মুসলিম জাতি, তোমরা জান কি যে, ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ দ্বারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পঙ্গু করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে? জাতি এতটা সরল ও অবুঝ হয়ে গেল কেন যে, তারা এই চিন্তাটুকুও করছে না, একটি জাতির শত্রুগোষ্ঠী কোনো দিন তাদের কল্যাণের চিন্তা করতে পারে না?

যেসব ইহুদি পুঁজিপতি আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিলো, গম, চাল ও ঘিয়ের মূল্যকে আকাশছোঁয়া করে দিয়ে জাতির শিশুদের মুখের গ্রাসটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিল, সাধারণ ওষুধের উপর আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এত পরিমাণ ট্যাক্স আরোপ করল যে, একজন গরিব মানুষ সেসব ওষুধের পরিবর্তে মৃত্যুকে বেছে নিতে শুরু করল, অলিতে-গলিতে ইন্টারনেট ক্যাফে খুলে জাতির কোমলমতি ছেলে-মেয়েদেরকে অশ্লীলতায় লিপ্ত করে তাদেরকে মানসিক ও দৈহিকভাবে প্যারালাইজ্‌ড করে তুলল, সেই আন্তর্জাতিক ইহুদি সংস্থাটি আমাদের জাতির এত সহমর্মী ও হিতকামী হয়ে গেল যে, তারা আমাদের নতুন প্রজন্মের ভাবনায় অস্থির হয়ে গেল! কেন?

বর্তমানে আল্লাহর শত্রুদের মাধ্যমে মানুষদের উপর, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের লোকদের উপর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পড়লে মানবতার শত্রুদের চিন্তা-চেতনার খোঁজ পাওয়া যায় যে, তারা কীভাবে মানুষের বিপক্ষে কাজ করছে, যার ফলে আজ মানুষ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তথাকথিত সভ্যজগতের অনিষ্টতা থেকে না মহাশূন্য নিরাপদ, না নদী-সমুদ্র, না পৃথিবী। প্রাকৃতিক খাদ্য-উপাদানের ব্যবহার শক্তির জোরে বিলুপ্ত করে ইংরেজি ওষুধাদি দ্বারা প্রস্তুত গম ও অন্যান্য বস্তু তৈরি করানো হচ্ছে, যা কিনা পুষ্টির স্থলে রোগের জন্ম দিচ্ছে।

জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে পানির ভাণ্ডারকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অঞ্চলগুলোতে মেহগনি বৃক্ষ লাগিয়ে এখানকার পরিবেশকে বিষাক্ত বানিয়ে মানুষকে এ্যাজমা রোগে আক্রান্ত করা হচ্ছে। পানির ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারগুলোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ লাগানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এগুলো কোন দেশ থেকে এসেছে, কাদের অর্থে এসব গাছ লাগানো হয়েছে এবং কাদের তত্ত্বাবধানে এসবের পরিচর্যা আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। খোঁজ নিলেই তথ্য পাবেন, এনজিওগুলো আমাদের দেশ ও ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডে কতটা তৎপর রয়েছে।

আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, দাজ্জালের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী? তা হলে উত্তর শুনুন, এসবের সঙ্গে দাজ্জালের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। হাদীছে আছে, ঈমানদাররা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পক্ষান্তরে ইহুদি ও পাপিষ্ঠ লোকেরা অধিকাংশই দাজ্জালের সঙ্গী হবে।

মোটকথা, দাজ্জালের এজেন্টরা মুসলমানদেরকে পাপের পথে টেনে নামাতে চায়। একটি বাস্তবতা এই যে, একজন অতিশয় সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানকেও যদি সন্দেহপূর্ণ খাবার খাওয়ানো হয়, তা হলে এর ক্রিয়া সবার আগে তার অন্তঃকরণের উপর পতিত হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ কাজটিতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীগুলোতে এমনসব কেমিক্যাল মেশানো থাকে, যেগুলো মানবদেহে প্রবেশ করে মানুষকে অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার দিকে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া এসব কেমিক্যাল মানুষের যৌনশক্তিকেও প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিশুদের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

বর্তমানে মুসলমান ডাক্তারদের কর্তব্য হলো, আপনারা জাতিকে সে-সকল অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করুন, আন্তর্জাতিক কুফরিশক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি আজ যার শিকার। যদিও বর্তমানে সময়টি এমন যে, সত্য বললে আগুন আর মিথ্যার সামনে মাথানত করলে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তথাপি কারও যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে যে, দাজ্জালের সময়ে যেটি আগুন হিসেবে পরিদৃশ্য হবে, সেটিই মূলত শীতল পানি হবে, তা হলে মুসলমান ডাক্তারদের সেই পথটিই অবলম্বন করা দরকার, যেটি তাদের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আমাদেরকে সব সময়ের জন্য স্মরণ রাখতে হবে, সত্য বলার অপরাধে যে-আগুন বর্ষিত হয়, এগুলোই আসলে ফুলবাগান। আর মিথ্যার সামনে মাথানত করার ফলে যে-ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এগুলোই মূলত আগুন।

অতএব, সাবধান হে মুসলমান!

খনিজ উপাদান

বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত খনিজ উপাদানের উপর প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত।

সম্পদ কুক্ষিগতকরণ

আপনি হাদীছে পড়েছেন, দাজ্জালের কাছে সম্পদের অসংখ্য ভাণ্ডার থাকবে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজ ইহুদিরা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে। পৃথিবী থেকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বিলুপ্ত করে সোনাকে নিজেদের কব্জায়

নিয়ে তারা বিশ্ববাসীর হাতে রং-বেরঙের কাগজের টুকরা (কারেন্সি নোট ইত্যাদি) ধরিয়ে দিয়েছে। এগুলোকে ইহুদি দাসত্বের শিকলে ফেঁসে যাওয়া বিশ্ব নোট কিংবা সম্পদ মনে করে থাকে। (তবে এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও ঘোর শীঘ্রই কেটে যাবে) বরং এখন তো মানুষের হাত থেকে নোটও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং হাতে প্লাস্টিকের কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবোধ মানুষটি প্লাস্টিকের কার্ডটি (ক্রেডিট কার্ড) হাতে ধরে নিজেকে কোটিপতি, বিলিয়ন-মিলিয়নপতি ভাবছে!

কম্পিউটারের কীবোর্ডের সামনে বসে হাতের আঙুলের ইশারায় কোটি টাকার হিসাবকারী সেদিন কী করবে, যেদিন কীবোর্ড টিপতে-টিপতে আঙুল ক্লান্ত হয়ে যাবে; কিন্তু নিজের অনলাইন একাউন্টের কোনো সন্ধান মিলবে না? এমন পরিস্থিতির একটি ঝলক গেল কিছুদিন আগে বিশ্ব অর্থমন্দার আলোকে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে, যেটি ছিল নিরেট ইহুদি মস্তিষ্কের সৃষ্ট ফসল এবং দাজ্জালের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার একটি অংশ। আমি মুসলমান ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেব, আপনারা নিজেদের কাছে রং-বেরঙের কাগজের টুকরো রাখার পরিবর্তে সোনা-রুপা রাখুন। অন্যথায় অতিশীঘ্র সমুদয় সম্পদ থেকে হাত ধুয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারেন।

ইহুদিরা প্রথমে বড়-বড় কোম্পানিগুলোকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল। এবার তারা নিম্নপর্যায়ে এসে প্রতিটি শহরে বড়-বড় শপিং প্লাজা প্রতিষ্ঠিত করছে, যেখানে ২৫ পয়সা মূল্যের টফি থেকে শুরু করে লাখ-লাখ টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রি হচ্ছে। এভাবে তারা পৃথিবীর অবশিষ্ট সম্পদও নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে চাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এই দুটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র পৃথিবীকে বর্তমানে নিজেদের দাস বানিয়ে রেখেছে এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও গঠনের পরিকল্পনা এখানেই প্রস্তুত হয়। দাজ্জালের অর্থনৈতিক ফেতনাকে যদি কেউ ভালোভাবে বুঝতে চায়, তা হলে আমি তাকে পরামর্শ দেব, আপনি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ঋণ চালু করার ও তা পরিশোধ করার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানুন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (W.T.O)

'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'। ইংরেজিতে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন'। পৃথিবীর অবশিষ্ট ব্যবসা ও অর্থনীতির উপর দস্যুবৃত্তি চরিতার্থের জন্য আন্তর্জাতিক দস্যুদল একটি গ্যাং তৈরি করেছে। এই গ্যাংটিরই নাম 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন'। এই সংস্থাটির কাজ হলো, পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তির জোরে ধ্বংস করে সেগুলোতে নিয়োজিত লাখ-লাখ শ্রমিককে বেকার বানিয়ে গরিবদের মুখ থেকে শেষ গ্রাসটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ধুঁকে-ধুঁকে মরতে বাধ্য করা।

সভ্যতার চাদর গায়ে জড়িয়ে তারা এই গ্যাংটির নাম দিয়েছে W.T.O.

এটি এতই পাষাণ ও নির্দয় প্রতিষ্ঠান, যার অত্যাচারের শিকার হয় নিরীহ গরিব মানুষ, চিকিৎসাবঞ্চিত অসহায় রোগী ও দুর্বল মানবশ্রেণী। কারণ, এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর।

W.T.O পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির অপতৎপরতার ফলে সবার আগে পোশাক শিল্প প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কৃষিখাতেও উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানে ২৭ লাখ একর ভূমিতে আখ চাষ হয়। অদূর ভবিষ্যতে এই ফসলটির কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, অধিক পরিমাণ আখ উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে বিশ্ববাজারে কম দামে চিনি সরবরাহ করা হবে, যার ফলে পাকিস্তানের ৭৭টি সুগার মিল বন্ধ হয়ে যাবে। এর পরিণতিতে হাজার-হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে।

মানবসম্পদ (HUMAN RESOURCES)

অপরাপর সম্পদের পাশাপাশি ইহুদিরা তাদের শত্রুদের মানবসম্পদকেও হয় পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে, না হয় নিজেদের দেশে ডেকে নিয়ে তাদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। আলেম বলুন বা বুদ্ধিজীবী বলুন, ইহুদিরা এমন প্রতিজন মানুষের উপর চোখ রাখছে, যাদের মেধা ও যোগ্যতা আছে। এদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমানের মাথা তারা ক্রয় করে নিয়েছে। যাদের মস্তিষ্ক ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে পাকিস্তানে সত্যাশ্রয়ী আলেমগণের গণহত্যা এই ধারারই একটি অংশ।

দাজ্জাল ও সামরিক শক্তি

পৃথিবীর ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতম অস্ত্র বর্তমানে ইহুদিদের হাতে রয়েছে। এই অঙ্গনে তারা আরও অধিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্রটি হলো 'জীবাণু অস্ত্র' (WEAPONS BIOLOGICAL)। এই অস্ত্রটি তৈরির কাজে 'বিড্স' (BIDS) নামক মেশিন ব্যবহার করা হয়। তারা এমন একটি অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেটি শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিরই উপর ক্রিয়া করবে।

অর্থাৎ– যদি তারা তাদের বিরুদ্ধবাদী কোনো সম্প্রদায়, গোত্র বা বংশকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলে যেহেতু উক্ত অঞ্চলে তাদের এজেন্টও থাকে, তাই এই অস্ত্রটি শুধু তাদের শত্রুরই উপর ক্রিয়া করবে আর আপনজনরা এই অস্ত্রের ক্রিয়া থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

অপরদিকে ইহুদিদের জোর প্রচেষ্টা হলো, প্রত্যেক ওই শক্তিটিকে নিরস্ত্র করে দেওয়া হবে, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরোধিতার সামান্যতম সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাকের অপরাধ এটিই ছিল।

পাকিস্তানের পরমাণু পরিকল্পনা ও পরমাণু বিজ্ঞানী

ইহুদি মনস্তত্ত্বের অধ্যয়ন আমাকে তথ্য প্রদান করছে, ইহুদিরা দু-ধরনের লোককে কখনও ক্ষমা করে না। এক. তাদের শত্রুদেরকে, দুই. তাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে। পাকিস্তানের পরমাণু পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা ড. আবদুল কাদীর খান ইহুদিদের নিকট সেই ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ইহুদি পরিকল্পনার পথে সরাসরি বিরাট এক প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি এমন একটি প্রাচীর ছিল, যাকে ডিঙানো ব্যতীত ইহুদিরা কোনো দিনও তাদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তবতার পোশাক পরাতে সক্ষম হতো না। কাজেই এটি অসম্ভব ছিল যে, তারা ড. খানের এই ক্ষমার অযোগ্য 'অপরাধ'কে এড়িয়ে যাবে। ফলে ড. আবদুল কাদীর খানকে এই অপরাধের শাস্তিদানের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ১৯৯০ সাল থেকেই শুরু করে দিয়েছিল। এর জন্য তাদের যাকেই ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, ব্যবহার করেছে।

২০০০ সালে সিআইএ'র ডেপুটি চীফ ভারত সফরের সময় ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. আবদুল কালামকে বলেছিলেন, 'আপনার নাম ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখা হবে; কিন্তু পাকিস্তানি পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এ. কিউ. খানকে অলিতে-গলিতে লাঞ্ছিত হতে হবে।'

পরমাণু প্রযুক্তির স্থানান্তরের রহস্য কী? এই আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও যদি বর্তমানে ইহুদিদের প্রস্তুতি ও পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত ও ইসরাইলের গাঁটছড়ার বিষয়টি অধ্যয়ন করি, তা হলে পরিস্থিতি একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিহাসের ভয়ানক ষড়যন্ত্র শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই ড্রামা পুরোপুরি ইহুদি গোষ্ঠী ও তাদের এজেন্টদের সৃষ্ট। হঠাৎ করে পরমাণু প্রযুক্তির স্থানান্তর বিষয়ে নীরবতা ছেয়ে গেল এবং স্বপ্নের জান্নাতে বসবাসে অভ্যস্ত লোকগুলোর মুখে আনন্দের দ্যোতি ফুটে উঠল যে, ঝড়ের আশঙ্কা কেটে গেছে।

ভারতের সঙ্গে একতরফা বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীদের ডি ব্রিফিং ও সিটিবিটি পর্যন্ত এই সবগুলো বিষয়ের একটিই লক্ষ্য যে, পাকিস্তানকে পরিপূর্ণরূপে নিরস্ত্র করে দেওয়া হবে এবং একবারের আক্রমণেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে ফেলা হবে, যাতে এই ভূখণ্ড থেকে দাজ্জালবিরোধী শক্তিগুলো

পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন কাফেরদের এই চাল সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সমাধান করেছে।

বলা হয়েছে :

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

'কাফেরদের ঐকান্তিক কামনা যে, তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র ও (যুদ্ধ) সরঞ্জাম থেকে উদাসীন হয়ে পড়, তা হলে তারা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে।'[৫৬]

যেকোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি অর্জন করাকে তারা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি মনে করে। সেজন্য তারা মুসলিম দেশগুলোকে নিরস্ত্র করে তাদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চাচ্ছে। অর্থাৎ– দাজ্জালবিরোধী কোনো শক্তির নিরস্ত্র হয়ে যাওয়াকে যেন তার বিশ্বভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে যাওয়া। তা ছাড়া এই 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' জিনিসটা কী? এর দ্বারা কোন ধরনের ভ্রাতৃত্ব উদ্দেশ্য? এবং তাদের নিকট এর সংজ্ঞা কী? আসলে এটি সেই অভিনব পরিভাষাগুলোর একটি, যেগুলো ইহুদিরা নিত্যদিন নিজেদের পক্ষ থেকে গড়ে নিয়ে থাকে। তারা এই পরিভাষাগুলোর বিশেষ অর্থ বুঝে থাকে। যদিও অবুঝ পৃথিবী সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদি ভ্রাতৃত্ব কিংবা তাদের সহযোগী-সমর্থক। ইহুদিবিরোধী কোনো জাতি-গোষ্ঠী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত নয়। বরং তারা মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বহির্ভূত, যারা কিনা মানবতার জন্য হুমকি। ভিন্ন শব্দে 'আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ'। তাই যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আফগানিস্তান ও ইরাকের বর্তমানে পরিস্থিতিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন', তখন একথার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, এসব অঞ্চলে ইহুদি স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন; সেজন্য ইহুদি ভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

বিশ্বনিরাপত্তা

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন একটি জগত, যেখানে ইহুদিদের পরিকল্পনার বিস্তৃততর ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও হাইকেলে সুলাইমানির নির্মাণে কোনো শক্তি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। এই নিরাপত্তা অর্জনেরই লক্ষ্যে আফগানিস্তানকে রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তার সন্ধানেই ইরাকের নিষ্পাপ শিশুদের জীবনগুলোকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সেই শান্তিমিশন, যার গতি

৫৬. সূরা নিসা ॥ আয়াত : ১০২

এখন পাকিস্তানের দিকে মোড় নিয়েছে এবং আমাদেরকে বাধ্য করছে, যেন আমরা নিজেদেরকে ভারতের সম্মুখে নত করে দিয়ে আমাদের আত্মমর্যাদা ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণদের উপর ছেড়ে দিই।

একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, শুধু মুসলিম দেশগুলোকেই নিরস্ত্র করা হচ্ছে কেন? অথচ ভারতকে সবদিক থেকে অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে? উত্তরটি হলো, ভারতের অস্ত্রসজ্জিত হওয়া 'বিশ্ব নিরাপত্তার' জন্য জরুরি আর পাকিস্তানের অস্ত্রসমৃদ্ধ থাকা 'বিশ্বশান্তির' জন্য হুমকি। এ ছাড়া আরও বহু পরিভাষা আছে, যেগুলো ইহুদিরা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন– মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি, সন্ত্রাসবাদ, সুবিচার ও নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব পরিভাষার মর্ম বুঝতে আমাদেরকে ইহুদিদের পরিকল্পনাসমূহ জানতে হবে। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত আমরা শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতীয় পরিভাষাসমূহের কান্না কাঁদতেই থাকব।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহুদি পরিভাষাগুলো না বুঝব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুঝে আসবে না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য ইহুদি মদদপুষ্ট শক্তিগুলো তাদের কাছে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের স্তূপ তৈরি করে চলছে আর মুসলিম দেশগুলোর হাত থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। পূর্বতিমুরকে স্বাধীন করিয়ে দিচ্ছে আর ফিলিস্তিন-কাশ্মিরে জালেমদেরকে মদদ দিচ্ছে। একজন ইহুদির মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব চিৎকার করে উঠছে আর মুসলিম উম্মাহর রক্ত দ্বারা নদী-সাগরকে লাল করে তোলা হলেও কারও মানবাধিকারের কথা মনে পড়ে না।

পাক-ভারত বন্ধুত্ব

বর্তমানে ইহুদি শক্তিগুলোর পূর্ণশক্তি দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি নিবদ্ধ। কারণ, তারা জানে, ইসলামি বিশ্বে ইরাকের পর এখন একমাত্র পাকিস্তানের কাছে সামরিক শক্তি রয়েছে। তা ছাড়া পাকিস্তানে বিরাজমান জিহাদি চেতনা – যা কিনা তাদের দৃষ্টিতে পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি ভয়ংকর – একদিন সেই বাহিনীটির অংশ হয়ে যেতে পারে, যেটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে হযরত মাহ্‌দির সাহায্যার্থে খোরাসান থেকে রওনা হবে।

এ-বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে দাজ্জালি শক্তিগুলো সর্বপ্রথম পাকিস্তানের নৈতিক ও ভৌগোলিক নিরাপত্তা-প্রাচীর তালেবান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়ে এবং কাশ্মির সমস্যাকে ভারতের ইচ্ছামাফিক সমাধান করিয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে যে, এখন আর তোমার পরমাণু অস্ত্রের কোনো আবশ্যকতা নেই। কাজেই এখন থেকে তুমি তোমার অর্থনীতিতে উন্নতি সাধনের প্রতি মনোনিবেশ করো এবং রাষ্ট্রকে অস্ত্রমুক্ত বানিয়ে সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে দাও।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দীর্ঘদিনের 'অখণ্ড ভারতে'র স্বপ্ন এখন সুদর্শন প্যাকেজের আকারে দৃশ্যপটে উপস্থিত হচ্ছে। বাজপেয়ীর পক্ষ থেকে অভিন্ন মুদ্রা চালুকরণ ও আদভানির পক্ষ থেকে কনফেডারেশনের প্রস্তাব এই শিকলেরই দুটি কড়া। তা ছাড়া পাকিস্তানে বসবাস করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রাখে এমনসব এনজিও ও হিন্দু বেনিয়াদের খুদ-কুড়ায় প্রতিপালিত জাতির বিশ্বাসঘাতক কিছু বুদ্ধিজীবী – যারা ভারতকে নিজেদের কেবলা ও কাবা বানিয়ে নিয়েছে – এই ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

আমাদের শাসক শ্রেণীটি খুবই উৎফুল্ল যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ফলে কাশ্মির সমস্যাটি এখন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং আমেরিকা এখন এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। কিন্তু বিষয়টিকে তারা ভুল বুঝেছেন। কাশ্মির সমস্যার প্রতি আমেরিকার মনোযোগী হওয়া আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ফল নয়, বরং এটি ইহুদি ও হিন্দুদের পররাষ্ট্রনীতির সুফল। কাশ্মির সমস্যাকে আমাদের স্বার্থের অনুকূলে সমাধান করা হবে না। বরং এই সমস্যাটির সমাধান করা হবে ইহুদি ও হিন্দুদের অভিন্ন স্বার্থের অনুকূলে।

মোটকথা, ইরাক ও আফগানিস্তানের পর ইহুদি পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধাটি হলো পারমাণবিক বোমা ও জিহাদি চেতনায় সমৃদ্ধ পাকিস্তান। এই বাধাটিকে তারা যেকোনো মূল্যে রাস্তা থেকে অপসারণ করতে চায়। ইতিহাস এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত ইরাক তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। ওরা এই মুসলিম রাষ্ট্রটিকে প্রথমে অস্ত্রমুক্ত করেছে। তারপর একে দখল করে নিয়েছে।

আমরা লালু প্রসাদকে ডেকে স্বাগত জানাই কিংবা নর্তকী-গায়িকাদের জাতির প্রতিনিধি বানিয়ে ভারত প্রেরণ করি, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মুখে রাম-রাম উচ্চারণের সাফ অর্থ এটাই যে, লালাজির বগলে ছুরি লুকানো আছে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ, ভারতের রাশিয়া থেকে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করা, পোল্যান্ড থেকে অস্ত্র খরিদ করা, ইসরাইল থেকে আধুনিক রাডার সিস্টেম ক্রয় ও এখন আমেরিকা থেকে এফ-১৬ ক্রয়ের আলোচনা করা এবং আমেরিকা ও ইসরাইলের ভারতকে পাকিস্তানের পরমাণু প্রোগ্রাম জ্যাম করার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে দেশদুটির মাঝে প্রেম ও বন্ধুত্বের রাগ প্রচারের উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমাদের যুবকদেরকে ভারতীয় নাগরিকদের চুলের বেণীর বন্দি বানিয়ে দেওয়া হবে, কাশ্মির মুজাহিদদেরকে পাকিস্তানের প্রতি অস্ত্রহীন করে তোলা হবে, কাশ্মিরে আটকেপড়া ভারতীয় সৈন্যদেরকে ফিরিয়ে আনা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করে তোলা। ব্রাহ্মণবাদীদের এটাই ঐকান্তিক কামনা।

বলা হচ্ছে, এই ভূখণ্ডকে শান্তিময় বানানোর লক্ষ্যে এমনটি করা হচ্ছে। কত সুন্দর যুক্তি! ভারতের ফ্যালকন রাডার, আধুনিক বিমান ও নৌজাহাজ থাকবে আর আমাদের হাতে একটি ক্লাশিনকোভও থাকবে না! ভারত কাঁটাতারের বেড়া দেবে, লাইন অফ কন্ট্রোলের উপর ক্যামেরা বসাবে, সেন্সর ও এলার্মিং সিস্টেম স্থাপন করবে আর আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেটটিও কমিয়ে দেব!

কী চমৎকার অভিলাষ!

এহেন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দেশ ও ধর্মের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাকে দৃঢ় করার কাজে আরও আন্তরিক ও সচেতন হওয়া দরকার এবং বন্ধুনির্ণয়ের কাজটি নিজ দেশের স্বার্থকে সামনে রেখে করা আবশ্যক – অন্য কারও স্বার্থকে সামনে রেখে নয়। কারণ, বীর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি সব সময় আপন প্রভু ও নিজ তরবারিধারী বাহুর উপরই ভরসা রাখে। নিজেকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এটিই জগতের রীতি, এটিই স্বভাবজাত বিধান।

পাক-ইসরাইল বন্ধুত্ব

দেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ বলছে, আরব দেশগুলো যখন ইসরাইলকে মেনে নিয়েছে, তখন আমরা কেন ফিলিস্তিনের ব্যথায় কাতর হব যে, তাদেরকে আমাদের শত্রু বানিয়ে রাখব? এরা দেশের সেই শ্রেণী, যারা প্রতি যুগে দেশ ও ধর্মের কপালে লাঞ্ছনার তিলক এঁটেছে। ডলারের বাজারে নিজেদের মান-সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদা ও বিবেক-বুদ্ধি নিলামকারী এই গোষ্ঠীটি সমগ্র জাতির কাছে আব্দার জানাচ্ছে, তোমরাও আমাদের মতো হয়ে যাও। এদের দৃষ্টান্ত হলো, অনেকগুলো শকুন মিলে একটি মৃত প্রাণীকে খাবলে খাচ্ছে। বাজপাখির একটি ক্ষুধার্ত শিশু বাজকে বলল, আমরাও ওখান থেকে গোশত খাই না কেন! আমরা যেমন পাখি, ওরাও তো পাখি। ওরা তো খাচ্ছে! উত্তরে বাজ তার শিশুসন্তানটিকে বলল, আমরা হলাম ঐতিহ্যময় পাখি। সেই জীবিকা থেকে মৃত্যু ভালো, যা খেলে উড়ালশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়। এই উত্তরে বাজছানাটি নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবে, তার নীতি-আদর্শ কী হওয়া উচিত। সে বুঝে ফেলবে, প্রয়োজনে না খেয়ে মরে যেতে হবে, তবু কখনও মড়া খাওয়া যাবে না। কারণ, এইমাত্র সে জানতে পেরেছে, উড়ালশক্তি তার ঐতিহ্য ও মর্যাদার প্রতীক। তার মনে এই অনভূতি জন্মাবে যে, উড়ালশক্তিই আমার জীবন।

কিন্তু যে-নাদান ও অথর্বরা উড়তে জানে না, যাদের চিন্তার উড়াল হোয়াইট হাউজের গম্বুজের চার পার্শ্বেই ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়, তারা আকাশের উচ্চতা ও পাহাড়ের দুর্গমতার গুরুত্ব কী বুঝবে? যাদের গায়ের পালকগুলো অর্থনীতির কেচি দ্বারা কেটে উড়ালশক্তি থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে, তারা শকুনদের মৃত

প্রাণীর গায়ে খাবলা খেতে দেখে নিজেরাও তাতে যুক্ত হয়ে যাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাদের দৃষ্টিতে পেট ভরে খাওয়ার নাম সফল জীবন। যাদের চোখের উপর ডলারের দাজ্জালি চোখ এঁটে গেছে, যাদের বিবেক গ্রীন কার্ডের বাজারে নিলাম হয়ে গেছে, যাদের তাওয়াফ চলে কুফরের রাজপ্রাসাদে, যারা কয়েকটি কাগুজে নোটের বিনিময়ে আপন মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়, এই নির্বোধরা কী করে জানবে, ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাঝে কী ক্ষতি? এত কিছুর পর তারা কী করে বুঝবে, একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ডের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি? তারা কোন সূত্রে জানবে, 'মাতৃভূমি' কোন বস্তুর নাম?

দাজ্জাল ও জাদু

দাজ্জালের কাছে সব ধরনের শয়তানি ও জাদুকরি শক্তি থাকবে। জাদুবিদ্যাকে এখন থেকেই নতুন এক ধারায় পরিচিত করা হচ্ছে। বড়-বড় শহরগুলোতে যথারীতি জাদুর মঞ্চশো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তা ছাড়া বর্তমানে পৃথিবীর বড়-বড় জাদুকররা ইহুদিসদস্য। তারা জাদুবিদ্যায় যারপরনাই উন্নতি সাধন করেছে। তাদের মধ্যে বড়মাপের কয়েকজন রাজনীতিক ও পৃথিবীর বড়-বড় কয়েকজন ব্যবসায়ীও রয়েছে। জাদুর বিভিন্ন ধরনের প্রতীক সমগ্র পৃথিবীতে ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেছে। যেমন– ছয় কোণবিশিষ্ট দাউদি তারকা (ডেভিড স্টার), পাঁচ কোণবিশিষ্ট তারকা, তরঙ্গের দৃশ্য, যেটি পেপসির বোতলে ছাপানো থাকে, সাপ আকৃতির সিঁড়ি, এক চোখ ও শতরঞ্জির নকশা ইত্যাদি। প্রতিটি প্রতীকের ক্রিয়া আলাদা। যেমন– পাঁচ কোণবিশিষ্ট তারকায় কারও নাম লিখে তাতে একটি মন্ত্র পাঠ করা হয়। তাদের দাবিমতে এর ক্রিয়া হলো মৃত্যু।

মিডিয়াযুদ্ধ

খলীফা আবদুল হামীদ দ্বিতীয় পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তা হলো, 'এগুলো শয়তানের সন্তান'। তিনি সঠিক মন্তব্যই করেছেন। কিন্তু তিনি যদি এ-যুদ্ধের মানুষ হতেন, তা হলে একে 'দাজ্জালের চোখ ও কণ্ঠ' নাম দিতেন।

দাজ্জাল আরবি 'দাজ্‌লুন' থেকে বুৎপন্ন। 'দাজ্‌লুন' অর্থ আচ্ছাদিত করা। দাজ্জাল অর্থ অনেক আচ্ছাদানকারী। দাজ্জালকে এজন্য দাজ্জাল বলা হয় যে, সে নিজের মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে ফেলবে। প্রতারণার মাধ্যমে সে বড়-বড় লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। তার ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মানুষ দেখতে-না-দেখতে ঈমান থেকে হাত ধুয়ে বসবে।

পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোর কর্মধারাও অনেকটা এ-রকম। তারা যে-বাস্তবতাকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে লুকানো প্রয়োজন বোধ করছে, তার গায়ে তারা

সংশয় ও সন্দেহের এমন চাদর জড়িয়ে দেয় যে, মানুষ তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে যে-বিষয়টিকে তারা প্রমাণিত করার ইচ্ছা করে, মিথ্যার হাজারো সুদর্শন গেলাফ চড়িয়ে তাকে সপ্রমাণিত করে ছাড়ে। যেমন– তারা যদি আজ সংবাদ প্রচার করে, সমগ্র অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রে ডুবে গেছে, তা হলে এই মিডিয়ায় আস্থাশীল বিশ্বের জন্য সংবাদটি বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না।

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো দাজ্জালের সংবাদ ও তার খোদায়িত্বকে পৃথিবীর কোনায়-কোনায় পৌঁছিয়ে দেবে এবং বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যেন সমগ্র পৃথিবী তার প্রভূত্বকে মেনে নিয়েছে আর সর্বত্র শান্তি-নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া পেছনে আমরা হিস্টনের উক্তি উদ্ধৃতি করেছি যে, দাজ্জালের সংবাদ আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। উক্ত সম্মেলনটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলে বসে দেখা যাবে।

এর জন্য তারা দু-ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক হলো পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া, যাতে প্রতিটি ঘরে টিভি ঢুকে যায়। দ্বিতীয় হলো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে (টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি) সহজলভ্য ও সস্তা করে দেওয়া, যাতে সমগ্র পৃথিবী একটি 'আন্তর্জাতিক পল্লীতে' (গ্লোবাল ভিলেজ) পরিণত হয়ে যায় এবং প্রতিটি সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কানে পৌঁছে যায়। এর জন্য এখন দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতেও টেলিফোন লাইন দেওয়া হবে। বরং ওয়ারলেস ব্যবস্থাকেও দ্রুত মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলা হবে। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর কিংবা ব্রেকিং নিউজগুলো ঘটনা ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার বেশিরভাগই ইতিমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে।

টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগে ও প্রচারমাধ্যমগুলো দাজ্জালি শক্তির জন্য এতই আবশ্যকীয় বিষয় যে, পৃথিবীর জনসাধারণ যদি এগুলোর ব্যবহার পরিত্যাগ করে, তা হলে আন্তর্জাতিক ইহুদিগোষ্ঠী এসব সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করবে এবং এগুলোর ব্যবহারের জন্য পুরস্কারের প্রজেক্ট ঘোষণা করবে।

বর্তমান যুগ ও সাংবাদিকদের দায়িত্ব

যেমনটি বলা হয়েছে, দাজ্জালের ফেতনায় বাস্তবতার চেয়ে মিথ্যা ও প্রতারণা বেশি থাকবে এবং সেই মিথ্যা-প্রতারণাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপায় হবে মিডিয়া। তাই যেসব সাংবাদিক নিজেদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত মনে করেন এবং নিজেদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখতে ইচ্ছা করেন, তারা সর্বাবস্থায় দাজ্জালি শক্তিগুলোর মিথ্যা ও প্রতারণার

বিরুদ্ধে নিজেদের কলম ও জবানকে ব্যবহার করুন। সারা বিশ্বের কুফরি মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করছে এবং নিজেদের ভুল ব্যবস্থাপনাকে শান্তি ও সুবিচারের আয়োজন হিসেবে প্রমাণিত করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমান সাংবাদিক ভাইয়েরা কি শুধু এই অজুহাতে আপন ধর্মের উপহাস-মশকারা সহ্য করে নিতে পারে যে, আমি যদি ইসলামের পক্ষে লিখি, তা হলে আমার চাকরি চলে যাবে?

এর অর্থ কি এই নয় যে, দাজ্জাল এসে বলবে, আমার কথা মেনে নাও; অন্যথায় তোমার রিযিক বন্ধ করে দেব? একজন কলামিস্টের কলমটি যদি সত্য লেখার অপরাধে ভেঙে দেওয়া হয়, বাতিলের ভয় যদি তার কলমের শিরায় চলমান কালিগুলোকে জমাট করে তোলে, তা হলে এমন পরিস্থিতিতে একজন ঈমানদার যেন নিজের কলিজার রক্তকে কালি আর আঙুলগুলোকে কলম বানিয়ে আপন ঈমানি দায়িত্ব পালন করে।

বাতিলের ভয়ে যদি আপনার কলম কাঁপতে শুরু করে, বিত্তের লোভ যদি কলমের পবিত্রতাকে পদদলিত করতে শুরু করে, তা হলে আপনি কলমটিকে ভেঙে নর্দমায় ছুড়ে ফেলে বন-বিয়াবানে চলে যান, যাতে আপনার কলম আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু লেখার অপরাধে অপরাধী না হয়। আপনার যাতে মাসীহাকে দাজ্জাল আর দাজ্জালকে মাসীহা লেখার দায়ে কলঙ্কিত হতে না হয়।

এটি কোনো সংগঠনের যুদ্ধ নয়। না কোনো রাষ্ট্রের, না বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর। বরং এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত ও ইবলিসের গোলামদের মধ্যকার লড়াই। বিশেষ কোনো বিভাগে নয় – এই যুদ্ধ চলছে মানবজীবনের সব কটি অঙ্গনে। তাই ইবলিসের গোলামরা সেই কাজগুলোই করছে, যেগুলো তারা জীবনভর করে আসছে। কিন্তু মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত কা'ব ইবনে আশরাফের উত্তরসূরীদেরকে আপন নবীর দীন-ধর্ম নিয়ে তামাশা করতে দেখে কীভাবে নীরব থাকবে?

ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ ও ইসলামের অন্যান্য শত্রু কবিরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে গোস্তাখি করত, তখন নবীজির পক্ষ থেকে ইসলামের কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রাযি.) কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দিতেন।

যদিও বর্তমান যুগে জীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সাংবাদিকতা বিভাগে সত্যাশ্রয়ী মানুষের সংখ্যা অল্পই চোখে পড়ছে; কিন্তু আসলে তারা অল্প নন। তাদের সঙ্গে আছে হাজার-হাজার নয়, লাখ-লাখ নিপীড়িত মুসলমান, শহীদের উত্তরসূরী ও সেই তরুণ-যুবকদের দু'আ, যাদের নিবেদন আল্লাহ কখনও ফিরিয়ে দেন না। একজন মুমিন যখন কোনো ঈমানদার কলামিস্টের এমন কোনো ক্ষুরধার কলাম পাঠ করে, যেটি আজও হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (র.)-এর

পদাঙ্ক অনুসরণ করে কা'ব ইবনে আশরাফের উত্তরসূরীদের জবাবের ভূমিকা পালন করে, তখন তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে তাদের জন্য দু'আ বেরিয়ে আসে যে, হে আল্লাহ, এদের তুমি আজীবন সত্যের উপর সুদৃঢ় রাখো এবং জালিমদের অনিষ্টতা থেকে এদের হেফাযত করো।

আমরা আগেও লিখেছি, যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শকে বিক্রি করে মাটির দেহটির রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছে, ইতিহাস তাদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। তাদের দ্বারা ইতিহাস একটি কালো অধ্যায় রচনা করেছে। পক্ষান্তরে যারা জীবন দিয়ে নিজের আদর্শ-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে, ইতিহাসের পাতা তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে ধারণ করে রেখেছে। জাতির শিশুরাও তাদেরকে হিরো ও আদর্শ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

অতএব হে কলম সৈনিকগণ! দাজ্জালি শক্তিগুলো মিডিয়ার ফুৎকারে ইসলামের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আপনি একদিকে ইসলামের অনুসারী, অপরদিকে একজন মিডিয়াকর্মী। এ-ক্ষেত্রে আপনি ইসলামের আমানতদার। আপনার কলমের উত্তাপ যেন ইসলাম-প্রদীপের আলোকে প্রজ্বালিত রাখে, সেক্ষেত্রে আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কলমের কালি যদি শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তা হলে নিজ দেহের রক্ত দ্বারা হলেও তাকে সচল রাখতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে আপনার দায়িত্বও ঠিক ততটুকু, যতটুকু দায়িত্ব অন্যদের। ভেবে দেখুন, বাতিল বাতিল হওয়া সত্ত্বেও আপন মিশনের উপর অটুট থাকছে। এমতাবস্থায় সত্যপন্থী ও সত্যের সৈনিক হয়ে আপনি ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হবেন না কেন? আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার রব আপনার জন্য এই জগতের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত জগত তৈরি করে রেখেছেন।

হলিউড

হলিউডকে ইবলিসি মতবাদের দুর্গ আখ্যায়িত করাই অধিক সঙ্গত। দাজ্জালি ব্যবস্থাপনার পথকে সুগম করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। এমন একটি বস্তু, যার অস্তিত্বই জগতে নেই, তাকে বাস্তবতার রূপ দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা এবং মডার্ন চরিত্রের মানুষদের মস্তিষ্কে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি ইহুদিদের প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনাসমূহের পক্ষে জনমত তৈরি করছে। আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের বুদ্ধিজীবী নামধারীরা কিছু নর্তকী-গায়িকার আঙুলের ইশারায় পুতুলের মতো নাচছে। কিন্তু তারপরও নিজেদেরকে প্রগতিবাদী ও মুক্তচিন্তার বাহক ভাবছে।

অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের বিবেক-বুদ্ধি সেই কবে হলিউডের বাজারে নিলাম হয়ে গেছে!

বেসরকারিকরণ (প্রাইভেটাইজেশন)

বড়-বড় কোম্পানিগুলোকে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নেওয়া এবং দেশের বড়-বড় মিল-কারখানার মালিকদেরকে শ্রমিকে পরিণত করার মিষ্টিমধুর নামটি হলো 'বেসরকারিকরণ'। এটি সম্পদ কুক্ষিগত করারই একটি প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক ইহুদি কোম্পানিগুলো যেকোনো দেশের অতিশয় মূল্যবান ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে কোটি-কোটি ডলার মূল্যে ক্রয় করে নেয়। ফলে দেখতে-না-দেখতে কালকের মালিক আজকের শ্রমিকে পরিণত হয়ে যায়।

পাকিস্তানের 'হাবীব ব্যাংক' আগা খানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাংকটি ৫২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হয়েছিল মাত্র দু-হাজার দুশো কোটি রুপিতে। অথচ শুধু 'হাবীব ব্যাংক প্লাজা'ই এই দামেরও বেশি মূল্যের সম্পদ। জাতীয় ব্যাংকগুলো ও অন্যান্য ও প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণে বাধ্য হচ্ছে, সেই আলোচনা পরে করা হবে।

দাজ্জালের প্রতারণা এই বেসরকারিকরণের কাজটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন এটি করা হলে ভাগ্যই বদলে যাবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বেসরকারিকরণের পক্ষে সবচেয়ে বড় যে-যুক্তিটি দেওয়া হয়, তা হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য বোঝা এমনসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি করা হলে সেগুলোকে উন্নয়ন সাধিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক হয়ে উঠবে। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তা হলে হাবীব ব্যাংকের মতো লাভজনক প্রতিষ্ঠানটিকে কেন বেসরকারিকরণ করা হলো এবং তারপর পাকিস্তান স্টিল মিলস্, হেভি মেকানিক্যাল কমপ্লেক্স, পিআইএ, পিটিসিএল ও ওয়াপদার উপর বিদেশি দস্যুদের চোখ পড়ল কেন? তখন এর জবাবে নীরবতা ছাড়া কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া এ-প্রশ্নটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি প্রতিষ্ঠান যখন সরকার পরিচালনা করে, তখন সেটি লোকসান দেয় আর সেই প্রতিষ্ঠানটিই যখন ইহুদি কোম্পানির মালিকানায় চলে যায়, তখন সেটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়, এর অর্থ জনগণ কী বুঝবে? সরকারের মাঝে কি সেই শক্তি ও যোগ্যতা নেই যে, বিদেশি কোম্পানিগুলো যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে, তারা তা নিতে পারে না?

এই বেসরকারিকরণের ইতিহাস যদি অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে সেখানে একটি অভিন্ন বিষয় চোখে পড়বে যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যারা ক্রয় করেছে, তারা সবাই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে বাইরে-থেকে-আসা এই কোম্পানিগুলো যেকোনো দেশের উপর দেখতে-না-দেখতেই ছেয়ে যায়। তারপর বড়-বড় শহরের বাহ্যিক সৌন্দর্যকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, মানুষ বুঝতে শুরু করে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আসার পর আমাদের দেশের ভাগ্য বদলে গেছে। কিন্তু এই প্রতারণার

বাস্তবতা সামনে আসে তখন, যখন ইহুদিরা এই দেশটিকে ব্যবহার করার পর অন্য কোনো দেশের অভিমুখী হয় আর পেছনে শুধু এমন কিছু খড়কুটো রেখে যায়, যা বন্যার পর নদীর কূলে রয়ে যায়।

ইহুদিরা এই বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং-এর ধারা জার্মান থেকে শুরু করেছিল। পরে ব্রিটেনকে কেন্দ্র বানাল। ব্রিটেনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই ইহুদি বিনিয়োগ নিইউইয়র্কের দিকে মুভ করতে শুরু করল এবং দেখতে-না-দেখতেই আমেরিকা পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। এবার আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, এই তথ্য সঠিক কিনা যে, ইহুদিরা এখন ধীরে-ধীরে আমেরিকার পরিবর্তে অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভিমুখী হচ্ছে?

যদি বেসরকারিকরণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে স্থানীয় লোকদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটত, তা হলে স্পেন অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রইল কেন? আমেরিকা ব্রিটেনের তুলনায় এগিয়ে গেল কীভাবে? মার্কিন ডলার ইউরোর মোকাবেলায় পড়ে যাচ্ছে কেন? তা ছাড়া এমনটি কেন হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক মার্কেট কখনও স্পেন, কখনও ব্রিটেন, কখনও জাপান, কখনও আমেরিকা, কখনও কোরিয়া?

এটি সেই ড্রামা, যার ব্যাপারে স্বয়ং ইহুদি প্রটোকল্‌স-এ লেখা আছে, 'আমাদের এসব পরিকল্পনা জগত বুঝতে পারবে না। আর যখন বুঝতে সক্ষম হবে, ততক্ষণে আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই বেসরকারিকরণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এটি এক অটল বাস্তবতা যে, ইহুদিরা যে-দেশে যায়, সেই দেশে অর্থের ছড়াছড়ি হয়ে যায় বটে; তবে তা গুটিকতক মানুষের হাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় কোম্পানিগুলো কয়েক বছরেই বাণিজ্যের এই সমুদ্রে বড় মাছগুলোর শিকারে পরিণত হয়ে যায়। জনসাধারণের কপালে যতটুকু জোটে, হংকং ও শিঙ্গাপুরের বাজারেই তা পরিদৃশ্য হয়। কী বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সরকারের পক্ষ থেকে অনবরত প্রচার করা হয়ে থাকে, আমরা আইএমএফ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের মুদ্রাবিনিময়ের স্টক ১২.২ বিলিয়ন ডলার হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব ও দরিদ্রতা দিন-দিন বেড়েই চলছে!

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ ভালোভাবেই জানেন যে, হাজার-হাজার নয়, দেশটির লাখ-লাখ) পরিবারের চুলার আগুন নিভিয়ে রেখে সরকার আইএমএফ থেকে মুক্তি অর্জন করেছে। আইএমএফ বিষয়টি মেনে নিয়েছে এজন্য যে, আমাদের সরকার তার সেই সকল শর্ত বিনা বাক্যব্যয়ে পূরণ করেছে, যেগুলো ইতিপূর্বেকার কোনো রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়িত করতে পারেনি।

আইএমএফ-এর সেই শর্তগুলোর মধ্যে বাজেটের ঘাটতি কমানো, বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করা ও করের হার বৃদ্ধি করা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যকে বাজারদরের সমান করে ফেলা, পেট্রোলের দাম প্রতি দুই সপ্তাহে বাজারের সমতালে নিয়ে আসা, রাষ্ট্রীয় মালিকানার বড়-বড় ব্যাংকগুলো বেসরকারিকরণ ও ওয়াপদা, রেলওয়ে ও পিআইএ'কে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই শর্তগুলো পূরণ করার কারণে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া এসব শর্তের ফলে লাভজনক হয়েছে বিদেশি কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। যার ফলে দেশীয় বিনিয়োগকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পোশাক শিল্প অনবরত লোকসানের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আমার বক্তব্য যদি এখনও কারও বুঝতে বাকি থাকে, তা হলে আমি তাকে পরামর্শ দেব, আপনি মার্কিন জনসাধারণের বর্তমান অবস্থাটা একটু দেখে আসুন। হংকং-এর স্থানীয় লোকদের অবস্থা অধ্যয়ন করুন। কেউ যদি শুধু আমেরিকার বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্যকেই গ্রহণযোগ্য মনে করে থাকেন, তা হলে তিনি বিখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি ও ফোর্ড অটোমোবাইল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনি ফোর্ড (১৮৬৩-১৯৪৭) এর লিখিত গ্রন্থ 'দি ইন্টারন্যাশনাল জিওয' অধ্যয়ন করুন। লেখক ইহুদি পুঁজিপতিদের নিয়েই বইটি রচনা করেছেন, যাতে তিনি এই ড্রামার আসল রূপ তুলে ধরেছেন এবং ব্যবসায় আন্তর্জাতিক বাজার কখনও স্পেনে, কখনও লন্ডনে, কখনও টোকিওতে, আবার কখনওবা নিউইয়র্কে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী? এই প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করেছেন।

এসব না করে যদি দেশীয় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তির সহায়তা নিয়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তাদের যেসব অধিকারের উপর দস্যুতা করছে, তার পথ বন্ধ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার রক্তচোষা পাঞ্জা থেকে তাদের জীবনকে মুক্ত করিয়ে আনা হয়, তা হলে এই জাতির সেই যোগ্যতা আছে যে, বিশ্ববাজারে সর্বত্র আমাদের উৎপাদিত পণ্য ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ী বন্ধুগণ এই বাস্তব সত্যটিকে খুব ভালো করেই জানেন।

পেন্টাগন

এটি দাজ্জালের অন্তবর্তীকালীন সামরিক হেডকোয়ার্টার। হ্যাঁ, দাজ্জালের আগমন উপলক্ষ্যে নানা সামরিক প্রস্তুতি এখান থেকেই সম্পন্ন হচ্ছে। 'পেন্টাগন' শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পাঁচকোণ'। কিন্তু তাওরাতের ভাষ্যমতে 'পেন্টাগন' হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সীলমোহর বা ঢালের নাম।

ইহুদিরা পৃথিবীতে ঠিক সেই রকম শাসনক্ষমতা কামনা করে, যেমনটি হযরত সুলায়মান (আ.) করেছিলেন। সেজন্য শক্তির নিদর্শনও তারা সেখান থেকেই গ্রহণ করে থাকে। পেন্টাগনে কর্মরত সমর বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই ইহুদি। অন্যরা তাদের আজ্ঞাবহ। এরা সমরবিদদের সেই দল, দাজ্জালের আগমনের সময়ে যারা তার সামরিক বিভাগের বিশিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের মাঝে ইস্‌ফাহানি ইহুদিদের বিশেষ একটি অবস্থান আছে। বর্তমানে তারা যেখানেই থাকুক এবং যে-ধর্মেরই লেবাস পরিধান করে থাকুন, সময়মতো আসল রূপে আবির্ভূত হবে।

হোয়াইট হাউস

এটিও একটি পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ সেই ভবন, যেখানে দাজ্জালের আগমনের আগে ইহুদি ধর্মনেতারা অবস্থান করবে। এই ধর্মনেতারা দাজ্জালের আগমনের পরে তার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত ইহুদিরা নানা ধর্মের ছদ্মাবরণ অবলম্বন করে আছে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে নিজেদের ইহুদি পরিচয় গোপন রাখছে।

ন্যাটো

স্নায়ুযুদ্ধের পর আইনত এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। স্নায়ু যুদ্ধের ড্রামার পর এটির কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। তা হলে বিলুপ্ত হলো না কেন? কারণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করা অবশিষ্ট ছিল। এর জন্য ন্যাটোকে শুধু জীবিতই রাখা হয়নি, বরং তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কারণ, এখন যে-লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে, তার সিংহভাগ দায়িত্ব ন্যাটোর উপর ন্যস্ত করা হবে।

ন্যাটো আপাদমস্তক একটি ইসলাম-দুশমন সামরিক প্রতিষ্ঠানের নাম, যার লক্ষ্য কালও ইবলিসি মিশন বাস্তবায়ন ছিল, আজও তার উদ্দেশ্য এটিই।

পরিবার পরিকল্পনা (ফ্যামিলি প্ল্যানিং)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

'অনুরূপভাবে তাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।' [৫৭]

---

৫৭. সূরা আন'আম ॥ আয়াত : ১৩৭

মুশরিক খ্রিস্টানদেরকে তাদেরই সতীর্থ ইহুদিরা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বয়ং তাদেরই হাতে তাদের বংশধারাকে ধ্বংস করিয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের পরিস্থিতি হলো, তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারপর ইহুদিরা এই কর্মপন্থাটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং একাজে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবছর হাজার-হাজার কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। এ-যাবত মানববংশ ধ্বংসের এত অধিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সংখ্যা নির্ণয় করাও দুষ্কর।

নাসা

এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেটি পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করে মহাশূন্যে দাজ্জালি শক্তিগুলোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে মহাশূন্যে বিদ্যমান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছে এবং তাদের যুদ্ধবিমান, মিশাইল ও পারমাণবিক বোমা সবকিছু এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। সম্প্রতি তারা 'ইনফ্রারেড' দুরবিন মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে। এই দুরবিনের মাধ্যমে এমনসব বস্তু দেখা যায়, যার মধ্যে উষ্ণতা আছে; যদিও সেটি সাধারণ চোখে দেখা যায় না।

এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো এটিই বলা হয় যে, এর মাধ্যমে মহাশূন্যে বিদ্যমান অনাবিষ্কৃত স্থানগুলো খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু যদি বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সামরিক প্রস্তুতির আলোকে দেখা হয়, তা হলে বলা যায়, এর উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে তারা সেই শক্তিগুলোকে দেখতে চাচ্ছে, যেগুলো সাধারণ চোখে দেখা যায় না।

ইহুদিদের প্রতিটি কাজই ইবলিসের পক্ষে ও তাকদিরের বিপক্ষে হয়ে থাকে। তাদের জানা আছে, জিহাদে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করে থাকে। তা হলে কি তারা এই দুরবিনের মাধ্যমে সেই আসমানি শক্তিগুলোকে দেখতে চাচ্ছে, যাতে তাদের মোকাবেলা করার কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়? এমনিতেই ইহুদিরা হযরত জিবরাইল ও হযরত মিকাইল (আ.)-কে তাদের পুরনো শত্রু মনে করে। তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটির অনেক গোপন মিশন আছে, যেগুলোকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও ইসলামি আন্দোলনসমূহ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পৃথিবী থেকে অন্যায়, অবিচার ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদকে ফরজ ঘোষণা করেছেন।

যেমন– তিনি বলেছেন :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

'আল্লাহ যদি কতিপয় মানুষকে (দুষ্ট ও দুরাচার লোকদেরকে) কতিপয় মানুষ (শান্তিপ্রিয় সৎকর্মপরায়ণ) দ্বারা দমন না করতেন, তা হলে পৃথিবীটা বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ মহাবিশ্বের উপর অনুগ্রহশীল। (তাই তিনি মুমিনদেরকে জিহাদের আদেশ প্রদান করেছেন, যাতে এই আমলটির মাধ্যমে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমন করা যায়)।'[৫৮]

এই আয়াতে আল্লাহপাক জিহাদের বিধান জারি করার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ও উপকারিতা আছে বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ–জিহাদের মধ্যে মানুষ পশু-পাখি, গাছ-পাতা, তরু-লতা ইত্যাদি সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই মহান আল্লাহর এই আমলটিকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখবেন এবং এটির বাস্তবায়নে তিনি বিশেষ কোনো জাতি কিংবা কোনো ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকবেন না। বরং এক ভূখণ্ডের মুসলমান যদি এই কর্তব্য পালনে উদাসীনতা দেখায়, তা হলে অপর কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করাবেন।

যেমন– পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন :

إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

'তোমরা যদি জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অপর কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন।'[৫৯]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও তাঁর উম্মতকে বারবার জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে বলে সংবাদ প্রদান করেছেন, যাতে উম্মত অলসতা ও উদাসীনতার শিকার হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। এ-কারণেই জিহাদ ফরজ হওয়ার সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি সত্যের অনুসারীরা প্রতিটি যুগে জিহাদের কর্তব্য আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। বদরের ময়দান থেকে যাত্রাকরা এই কাফেলা ইরানের অগ্নিশিখাগুলোকে শীতল করে দিয়েছে। আফ্রিকার সুবিস্তৃত বন-বাদাড়কে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে। উন্দুলুসের সবুজ-শ্যামল ভূমিকে তাওহীদের সিজদা দ্বারা ঝকমকিয়ে দিয়েছে। সিন্ধুর মরুভূমির চোরাবালিতে আটকে-যাওয়া-মানবতাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। হিন্দুস্তানের মাটিকে একত্ববাদের মধুর গান দ্বারা বিমোহিত করেছে। ত্রিত্ববাদের প্রাণকেন্দ্র কুস্তুন্তুনিয়াকে আল্লাহর একত্ববাদের পূজারি

---

৫৮. *সূরা বাকারা ॥ আয়াত : ২৫১*
৫৯. *সূরা মুহাম্মাদ ॥ আয়াত : ৩৮*

বানিয়েছে। হিংস্রতা, পশুত্ব ও বর্বরতায় অভ্যস্ত ইউরোপের অধিবাসীদেরকে মানবতার পাঠ শিক্ষা দিয়েছে।

এভাবে এই কাফেলা প্রতিযুগে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে পৃথিবীতে কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভালো ও মন্দের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইমাম শামিল (রহ.)-এর দাগেস্তান থেকে চেচনিয়া পর্যন্ত, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর রায়বেরেলি থেকে বালাকোট পর্যন্ত এবং শামেলি থেকে কাশ্মির পর্যন্ত অঞ্চলে সফর করে আফগানিস্তানে এসে পুনরায় নতুন ও ভরপুর অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং দেখতে-না-দেখতেই এই জিহাদ মুসলমানদের কাছে নতুনভাবে প্রমাণ করেছে, মুগুর ছাড়া কুকুর দমন করা যায় না। পৃথিবীর বুকে মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখায় জিহাদের কোনোই বিকল্প নেই।

এ-কারণেই বিশ্ব কুফরি শক্তিগুলো – যাদের প্রধান সেনাপতি বর্তমানে আমেরিকা – এখন কারও নিন্দা, প্রতিবাদ ও তিরস্কারের পরোয়া না করে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বশেষ বিশ্বসন্ত্রাসী দাজ্জালের পথের প্রতিটি বাধা অপসারিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় লালন করছে। ক্রুসেড যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের মুখ থেকে বিশ্ব যে-বক্তব্য শুনেছে, সেটি মুখ ফস্‌কে-বের-হওয়া আবেগতাড়িত কোনো উক্তি ছিল না। বরং বুশ যা বলেছেন, বাস্তবেও বিষয়টি তেমনই যে, সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

সেজন্য তাদের প্রথম টার্গেট বিশ্বব্যাপী পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনগুলো। তবে বুশের খোদা (ইবলিস কিংবা দাজ্জাল) এই যুদ্ধ সম্পর্কে তাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটি সেই প্রতিশ্রুতি, যা বদর যুদ্ধের আগে আবুজাহ্‌লের খোদা তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিল। বদর যুদ্ধের আগে আবুজাহ্‌লের খোদা ইবলিস তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার মুখ দেখেনি। এখনও যদি বুশের খোদা তার সকল সাঙ্গ-পাঙ্গ ও ভক্ত-অনুচরদের নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তবু জয় ইসলামেরই হবে। মুহাম্মাদে আরাবির রব সেদিনের মতো আজও মুজাহিদদের সাহায্যে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করছেন। বিজয় ও সফলতা ঈমানদারদের জন্যই অবধারিত, যা প্রতিটি যুগেই তারা পেয়ে আসছে। এখানে আমরা বিশ্বব্যাপী পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনগুলো নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করছি।

ফিলিস্তিন জিহাদ

এই আন্দোলন তার ইতিহাসে অনেক চড়াই-উতরাই প্রত্যক্ষ করেছে। নানা স্লোগান ও নানা দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ এর উপর পড়তে থাকে। একের-পর-এক

প্রতিশ্রুতি, সেমিনারের-পর-সেমিনার ও আলোচনার-পর-আলোচনার চক্করে একে ফাঁসিয়ে রাখা হয়েছিল। এই আন্দোলনে জগতের সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু মজলুম আরও মজলুম এবং হানাদার ঘৃণ্যতর হানাদারে পরিণত হতে থাকে। ফিলিস্তিনিরা কোনো দরজা বাদ রাখেনি, যেখানে তারা সুবিচারের ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হয়নি। কিন্তু প্রতিটি দরজা থেকে একই উত্তর পাওয়া গেছে, এ-জগতে দুর্বলের ইনসাফ নয় – জুলুমই প্রাপ্য। যাদের বাহুতে মীমাংসা করাবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, হানাদার জাতিগুলোই তাদের বিচার-মীমাংসা করে থাকে।

সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর ফিলিস্তিনিরা সেই পথটিই বেছে নেয়, যেখানে মীমাংসার জন্য ভিক্ষার হাত পাতা হয় না। যেখানে ইনসাফের জন্য জালিমদের দ্বারে করাঘাত করার কোনোই নিয়ম নেই। বরং নিপীড়িত জাতি নিজেরাই বিচারের রায় পড়ে শোনায়।

ফিলিস্তিন আন্দোলন যখন থেকে ইসলামি রং ধারণ করল, তখন থেকে ইহুদিদের মতো ধোঁকাবাজ জাতিটির হুঁশ ঠিকানায় এসে পড়ল। মুসলমানদের জন্য আল্লাহপাক এই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন যে, সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জিহাদ করতে হবে। এছাড়া যদি জাতিপুজা কিংবা অঞ্চলপুজার যুদ্ধ লড়া হয়, তা হলে তাতে মুসলমানদের সম্মান অর্জিত হয় না। সকল ইসলামি আন্দোলনে আমরা এই নীতিমালার প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি। সেটি ফিলিস্তিন আন্দোলন হোক কিংবা কাশ্মির বা চেচেন আন্দোলন। এই ইসলামি আন্দোলন জগতের চরম ধোঁকাবাজ জাতিটির সকল পরিকল্পনার গায়ে পানি ছিটাতে শুরু করেছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর অত্যাধুনিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ইহুদিদের হাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুজাহিদরা ইসরাইলের হৃদপিণ্ডে ঢুকে ইহুদিদেরকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত আরব জাতীয়তা একত্র হয়ে ইহুদিদের যে-পরিকল্পনা প্রতিহত করতে পারেনি, আরবের রাজনৈতিক বাজিকররা ক্যাম্প ডেভিড ও অস্‌লোতে ইহুদি প্রতারণার সম্মুখে যে-বাজিতে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল, এই মুজাহিদরা বছরকয়েকের মেহনতে সেই বাজিকে উলটে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এই আন্দোলনের আগে তুরুপের সব কটি তাস ইহুদিদের হাতে ছিল। তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী খেলার চিত্র পালটে দিত। কিন্তু এই নিবেদিতপ্রাণ নওজোয়ান আর আত্মর্যাদাসম্পন্ন বোনদের কিছু ত্যাগের বদৌলতে বাজি আজ মুজাহিদদের হাতে।

মুসলিম বিশ্বের জন্য এ এক বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় যে, যতদিন পর্যন্ত জিহাদ ছাড়া অন্য সকল প্রচষ্টা অব্যাহত ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহুদিরা বিস্তৃত ইসরাইলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছিল এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে ইহুদিরা ইসরাইল

গিয়ে বসতি গড়ছিল। তখন আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, নিজেদের বাস্তুভিটা থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হচ্ছিল। কিন্তু যখন থেকে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হলো, তখন বাজি উলটে দেওয়া হলো। এখন যে-আমাদেরকে উদ্বাস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই আমরা নতুন স্বপ্ন ও নতুন আশা নিয়ে আপন ভিটায় ফিরতে শুরু করেছি। তারা এখন পুনরায় সেসব পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছে। যে-জায়গাটিকে তারা তাদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল কল্পনা করত এবং পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে এসে-এসে ইসরাইল সমবেত হচ্ছিল এই লক্ষ্যে যে, ওখানে আন্তর্জাতিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব, সেই ভূখণ্ড এখন তাদের জীবন্ত সমাধিতে পরিণত হচ্ছে। আর এ হলো সেই দিনটির সূচনা, যেদিন তাদের উপর পরাক্রমশালী আল্লাহর গজব আপতিত হবে। সেদিন তাদের কী পরিণতি হবে, যেদিন আশ্রয়ের জন্য তারা একতিলও ঠাঁই খুঁজে পাবে না!

এটি এক অমোঘ বাস্তবতা। এর মধ্যে পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে যে, জিহাদের মাঝে আল্লাহ আজও সেই শক্তি রেখেছেন, যা পৃথিবীর প্রবল-থেকে-প্রবলতর শক্তিধর শত্রুর চোখের ঘুম হারাম করে দিতে পারে। যে-ইহুদিরা বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে দাপটের সঙ্গে নিজেদের পলিসির বাস্তবায়ন করে চলেছে, আজ আত্মঘাতী সমরাভিযান তাদের মস্তিষ্কগুলোকে বেকার করে তুলেছে যে, এখন কোনো কৌশলই তাদের মাথায় ধরছে না। তাই কখনও শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনওবা অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।

আল্লাহ পাক মহান জিহাদের মাঝে এই ক্রিয়া রেখেছেন যে, যদি জিহাদ অব্যাহত রাখা হয়, তা হলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সকল অস্থিরতা-পেরেশানি শান্তি ও স্বস্তিতে পরিণত হয় এবং গন্তব্য পরিদৃশ্য হতে শুরু করে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ফিলিস্তিন জিহাদ অন্য সকল আন্দোলনের জন্য একটি মাপকাঠির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এর থেকে সকল ইসলামি আন্দোলনের বহুকিছু শিখবার প্রয়োজন রয়েছে। একটি কারণে ফিলিস্তিন জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও বেড়ে যাচ্ছে যে, এটি এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে মীমাংসা হবে যে, এই জগতে ভালো-মন্দ, হক-বাতিল ও পাপ-পুণ্যের মধ্য থেকে কোনটির পতন ঘটবে আর কোনটি টিকে থাকবে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লড়াই রণাঙ্গনেই লড়া হবে। এই আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া সরাসরি সেই দাজ্জালি পরিকল্পনাগুলোতে পতিত হয়, যেগুলো দাজ্জালের এজেন্টরা তৈরি করে নিয়েছে। তাই সমগ্র ইসলামি বিশ্ব ও প্রতিজন ঈমানদারের যার যেমন ও যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা কর্তব্য।

আমরা সালাম পেশ করছি সেই যুবকদের, যারা আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তার শত্রুদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পরিণত হয়ে আছে।

আফগান জিহাদ

আফগান জিহাদ দেখতে-না-দেখতেই ইসলামি বিশ্বে জীবনের নতুন এক ঢেউ তৈরি করে দিল। কতিপয় আল্লাহপ্রেমিক বান্দা যখন একটি ভূখণ্ডে আল্লাহর শাসনব্যবস্থা চালু করল, তখন কুফরের সমস্ত ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মাকড়সার জালের মতো দুর্বল প্রমাণিত হলো। তালেবানের আন্দোলন রাতের পথিকদেরকে ভোরের আগমনিবার্তা শোনাল। কনকনে শীতের মধ্যে থরথর কম্পমান লোকগুলোকে নিজেদের রক্ত দ্বারা উষ্ণতা দান করল। ইল্‌মে দীনের বাহকদের হৃদয়ের অলস সমুদ্রকে তরঙ্গমালা দ্বারা সমৃদ্ধ করল। অত্যাচার ও নিপীড়নের মরুভূমিগুলোতে পথহারা পথিকদেরকে সবুজ বাগানের গুরুত্ব অবহিত করল। কাপুরুষতা ও আত্মমর্যাদাহীনতাকে যারা তাকদির অভিধায় ভূষিত করে বসে ছিল, তাদেরকে তাকদিরের মর্ম বুঝিয়ে দিল।

তালেবানের অপরিসীম কুরবানির বদৌলতে বাজছানাদের গায়ে পালক গজাল। তাদের মধ্যে বাজ-আত্ম জেগে উঠল। দুগ্ধপোষ্য অবুঝ শিশুরা আত্মপরিচয় লাভ করল। তারপর তারা অন্ধকার ভেদ করে সামনের দিকে এগুতে লাগল। মরুভূমিগুলোকে সবুজ বাগানে পরিণত করে দিতে শুরু করল। শান্ত নদীগুলো উথলে উঠল। মজলুমরা উঠে দাঁড়িয়ে জালিমদের হাত ধরে ফেলল। ফেরাউনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিল। প্রেম নমরুদের আগুনকে বরণ করে নিল। আর আজ? আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জুলুমের বিরুদ্ধে জোরে-শোরে জিহাদ চলছে।

জিহাদবিদ্বেষী ও জিহাদবিরোধীরা যা খুশি বলুক। এ-বিষয়টি ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়ে গেছে যে, খেলাফতে ওছমানিয়ার পতনের পর আফগান জিহাদের আগ পর্যন্ত যত লাশের হাট বসেছে, সবগুলোই ছিল শুধু ঈমানদারদের। যত মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিল, সবাই ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সদস্য। যত ওড়না, যত চাদর নিলাম হয়েছিল, সবগুলোই ছিল এই উম্মতের মা-বোন-কন্যাদের। সন্তান শুধু আমাদেরই এতিম হয়েছিল। মায়ের কোল শুধু এ জাতিরই খালি হয়েছিল। বিধবা শুধু ঈমানওয়ালী নারীরাই হয়েছিল।

কিন্তু আফগান জিহাদের পর এখন চিত্র পালটে গেছে। এখন যদি কোনো দিন আমাদের ঘরে চুলায় আগুন না জ্বলে, তা হলে রুটি ঘাতকদেরও কপালে জোটে না। মাতম যদি আমাদের ঘরগুলোতে হয়, তা হলে তাদের ঘরেও আমরা উৎসব হতে দেই না। আমাদের বাড়ি-ঘর যদি অগ্নিদগ্ধ হয়, তা হলে যারা

আমাদের ঘরে অগ্নিসংযোগ ঘটায়, তাদেরও ঘর ভস্মীভূত হয়। আমরা যদি বিচলিত হই, বিমর্ষ হই, তা হলে তাদেরকেও শান্তিতে থাকতে দেই না। তুষারকবলিত রাতে আমরা যদি ঘুমোতে না পারি, তা হলে নিদ্রা তাদের থেকেও কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থান করে। আমরা যদি বাস্তুহারা, ভিটেমাটিহারা হয়ে থাকি, তা হলে আপন ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তানদের দর্শন তাদেরও নসিব হয় না। হিসাব এখন দুইতরফা চলছে। কখনও তারা আগে, আমরা পেছনে, কখনওবা আমরা আগে, তারা পেছনে। আর আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের ধাওয়া করতেই থাকব। অবশেষে আমরাই সফল হব। কারণ, আমরা আমাদের রবের কাছে এমন শক্তি ও সাহায্যের আশা রাখি, যা কাফেরদের কপালে জুটবার মতো নয়।

এই চেতনাকে বুকে ধারণ করেই বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে চলমান ইসলামি আন্দোলনগুলো কুফরি বিশ্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। যদিও এটি এক বাস্তবতা যে, মুজাহিদদের কাছে যে-অস্ত্র আছে, কাফেরদের মোকাবেলায় তা না থাকারই সমান। কিন্তু এটা বিচলিত হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। কারণ, প্রতি যুগে ঈমানদারদের এই অবস্থায়-ই ছিল। মুমিন সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা করেই ময়দানে বের হয়।

কুফরিশক্তিগুলো এই বাস্তবতাকে ভালো করেই বোঝে। তাই বিশ্বকুফরিশক্তি দাজ্জালের আগমনের আগে-আগে সেই শক্তিগুলোকে পিষে ফেলতে চাচ্ছে, যেগুলো দাজ্জালের পথে তিলপরিমাণও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। আফগান মুজাহিদরা রাশিয়াকে পরাজিত করার পর এক পর্যায়ে তালেবান ইবলিসি পরিকল্পনাগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আফগানিস্তানে ইসলামি আইন চালু করে মুসিলম বিশ্বের জন্য একটি নমুনা উপস্থাপন করেছিল যে, চৌদ্দশো বছর পর আজও ইসলামের সেই পুরনো শান বিদ্যমান। তবে শর্ত হলো, চেতনা সঠিক ও সাহস জীবন্ত হতে হবে।

তালেবান আন্দোলনের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য কতখানি, তা অনুমান করতে হলে আমাদেরকে আগে খেলাফতের গুরুত্ব ও ইহুদিদের অবস্থান-চরিত্র গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। তা ছাড়া তালেবানকে যথাযথভাবে না বুঝে যারা এয়ারকন্ডিশন্ড কক্ষে বসে তালেবানের বিরুদ্ধে জিহ্বা সঞ্চালন করেন, তারা তালেবানের এই মহান কর্মযজ্ঞ ও তার গুরুত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হবেন না, যতক্ষণ-না তারা নিজেদের চোখ থেকে দাজ্জালি মিডিয়ার চশমা খুলে এই আন্দোলনটিকে কুরআন ও হাদীছের চোখে দেখবেন।

আফসোস, খেলাফতের দুশমনরা এই আন্দোলনকে সঠিক অর্থে বুঝে ফেলেছে। কিন্তু ঈমানের দাবিদাররা এই আন্দোলনকে সেভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি, যেভাবে বোঝা আবশ্যক ছিল। আফগানিস্তানে ইসলামি শাসনের অবসানের

পর তালেবানবিরোধী জিহ্বাগুলো আরও শাণিত হয়ে গেছে। তালেবানের এই পতনে যারা উল্লসিত হয়েছিল, তাদের মাঝে বহু লোক এমনও ছিল, নিজেদের ব্যাপারে যাদের ধারণা ছিল, তারা মুসলমান।

বহু মানুষ এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিল যে, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, জিহাদ দ্বারা কোনো উপকার হয় না। কিন্তু এই ভদ্রলোকগুলো বুঝতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহ তার বান্দাদের কাছে কী চান?

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে এই কামনা করেন যে, তাঁর নাম উচ্চারণকারীরা সর্বাবস্থায় তাঁর একত্ব ও রাজত্বের বিশ্বাসের উপর অটল থাকবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে তারা জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেবে। হক ও বাতিলের মধ্যকার এই যুদ্ধ ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ গা বাঁচানোর যুদ্ধ নয়।

এই চেতনাটি জাগরূক রেখেই তালেবান নিজেদের ঈমান-আকীদাকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ক্ষমতাকে কুরবান করে দিয়েছিল। নিজেদের ঘর-বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হওয়াকে বরণ করে নিয়েছিল। নিজেদের সুখ-শান্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তথাপি ঈমানের সওদাকে বরণ করে নেয়নি। সর্বশক্তি প্রয়োগ করার পরও কাফেররা তালেবানকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শ থেকে এক বিঘতও সরাতে পারেনি। এত কিছুর পরও যখন কেউ বলে, জিহাদের কোনো উপকারিতা নেই এবং তালেবান পরাজিত হয়েছে, তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কুরআন-হাদীছ তথা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণেই তারা এসব কথা বলছে।

তালেবানের আফগানিস্তান পৃথিবীর সবগুলো ইসলামি আন্দোলনের জন্য সেই মায়ের মতো ছিল, যার প্রয়োজনীয়তা সংসারে সর্বাবস্থায় অনুভূত হয়। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট থাকে, তখনও মা সংসারের কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। সন্তানরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, মায়ের মর্যাদা তখনও মৌলিকই হয়ে থাকে। সংসারের প্রতিজন সদস্যের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখা এবং পরিবারটিকে আগলে রাখা মায়েরই কাজ বটে।

ইবলিসি শক্তিগুলো 'ইমারাতে ইসলামী'র এই মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই মা তার সন্তানদের ভবিষ্যত জীবনে কী ভূমিকা পালন করতে পারত এবং পরিস্থিতির প্রতিকূলতা থেকে তাদেরকে কীভাবে আশ্রয় সরবরাহ করার সম্ভাবনা ছিল, ইহুদি ও তাদের মিত্ররা এসব ভালোভাবেই জানত। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে-লোকগুলোর কুরআনের প্রতি বিশ্বাস আছে, কুরআনের এই রাষ্ট্রটির গুরুত্ব তারা বুঝতে সক্ষম হলো না। আহ্, আহমদ শাহ মাসউদ যদি তালেবানের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করত, তা হলে আজকের পৃথিবীর চিত্র ভিন্ন রকম হতো!

আহমদ শাহ মাসউদ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের জন্য যে-কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছিল, তার জন্য সে নোবেল পুরস্কারের উপযোগী হয়ে গেছে। তাকে যদি এ পুরস্কারটি দেওয়া না হয়, তা হলে এটি তার আত্মার সঙ্গে বড়ই বেঈমানি হবে।

রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের আলোকে বর্তমান আফগান আন্দোলন দিন-দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই আন্দোলন জোরদার হওয়া মানে সমগ্র পৃথিবীর সকল ইসলামি আন্দোলন জোরদার হওয়া। কেননা, মহান আল্লাহ এই ভূখণ্ডটিকে আল্লাহওয়ালাদের কেন্দ্র বানিয়েছেন এবং সকল ইসলামি আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ এই ঘাট থেকেই পানি পান করে থাকেন। সব আন্দোলনের ফোয়ারা এই কূপ থেকেই নির্গত হয়।

আফগানিস্তানে চলমান আমেরিকাবিরোধী অভিযানগুলো মুসলমানদের অন্তরে আশার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে চলেছে। মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে আফগানিদের এই সফলতায় ঈমানদারদের হৃদয়রাজ্য চেতনার বজ্রে ভরে গেছে। এসব বজ্র বাতিলের উপর বর্ষিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কাজেই আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, গোটা দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদেরকে তাদের কর্মপদ্ধতি এই ভূখণ্ডটিকে সামনে রেখেই তৈরি করা উচিত। এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান মুজাহিদদেরকে যার-যার সাধ্যানুযায়ী সাহায্য দিয়ে আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক। এই মুহূর্তে যে-অঞ্চলেই মুজাহিদগণ কাজ করছে, আপন-আপন অঞ্চলের কার্যক্রম চালু রেখে রিজার্ভ শক্তিটি আফগানিস্তানেই ব্যয় করা দরকার।

এই ভূখণ্ডে যতখানি শক্তিশালী শত্রুর উপস্থিতি রয়েছে, সেই অনুপাতে আল্লাহর সাহায্যও আসছে। আফগানিস্তানে দাজ্জালি বাহিনীগুলো এ-যাবত যে-পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, তার পুরো চিত্র যদি বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়, তা হলে বিজয়ের নেশায় চুর আমেরিকানদের সবটুকু নেশা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আমেরিকা সত্যকে যতই লুকিয়ে রাখুন, অদূর ভবিষ্যতে আসল চিত্র বিশ্বের সম্মুখে উন্মোচিত হবেই। তখন বিশ্ব জানতে পারবে, গল্প-উপন্যাস ও ফিল্ম-ড্রামায় নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার কাহিনী বর্ণনাকারী জাতির সৈনিকরা কত বীর এবং আল্লাহর হিংসদের মোকাবেলায় তারা কত সাহসী।

মানুষ বলাবলি করছে, আমেরিকাকে রাশিয়ার মতো আফগানিস্তান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু না, এই মন্তব্য সঠিক নয় – আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে পালাতে হবে না। কারণ, এটি চূড়ান্ত লড়াই। এটি সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ। কাজেই রাশিয়ার তো পলায়ন নসিব হয়েছিল; আমেরিকার কপালে পলায়ন জুটবে না। তা ছাড়া এযাত্রা মুসলমানরাও আমেরিকাকে পালাবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। বিশ্বচরাচর দেখবে, আফগানিস্তান আমেরিকার সমাধিতে

পরিণত হয়ে গেছে। আমেরিকা এখানে যত পরাজিত হবে, ততই সৈন্য পাঠাতে থাকবে।

সিদ্ধান্তমূলক এই যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। আপনি যদি আপনার মর্যাদা বুলন্দ করতে চান, খোরাসানের মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে যে-ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, আপনার অন্তরে যদি সেই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে এই বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যান। নগরজীবনে যদি আপনার ঈমান ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, তা হলে উঠুন এবং এই কাফেলায় শামিল হয়ে যান। মুজাহিদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বটিও যদি পেয়ে যান, খুশিমনে গ্রহণ করুন।

এটি আমার আহ্বান সেই লোকদের জন্য, যারা দাজ্জালের ফেতনা থেকে দূরে থাকা সংক্রান্ত হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে ইচ্ছুক যে, শহর-নগর দাজ্জালের ফেতনার কেন্দ্র হবে আর শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে পাহাড়ে। কাজেই দাজ্জালি ফেতনা থেকে বের হয়ে নিজের ঈমানকে রক্ষা করার এখনই সময়।

এটি আমার আহ্বান সেই আহ্‌লে ইল্‌মের জন্য, যারা প্রকৃত অর্থেই নবীগণের উত্তরসূরী যে, মুজাহিদদেরকে দীন শেখানোর লক্ষ্যে আপনারা সেই বাহিনীতে শামিল হয়ে যান, যে-বাহিনীটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন হাদীছের প্রয়োগক্ষেত্র এবং যার সত্যতার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। সর্বোপরি যেখানে কোনো বিরোধ বা দলাদলি নেই।

এটি আহ্বান উম্মতের মায়েদের জন্য যে, তোমাদের সন্তানদের তোমাদের দু'আর প্রয়োজন। তোমাদের সাহস ও উৎসাহ প্রদান খুবই দরকার। এটি ফরিয়াদ সেই বোনদের কাছে, যারা দেখতে চায় আমাদের ভাইয়েরা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করুক। তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে এই বাহিনীর সৈনিক বানানোর ক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য পালন করো। তাদেরকে এই মর্মে প্রস্তুত করো যে, তারা দুনিয়াদারি থেকে বের হয়ে জিহাদের দাওয়াতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিক এবং সেই বাহিনীকে শক্তি জোগাক, যারা অনাগত পরিস্থিতিতে তোমাদের সম্ভ্রমের পাহারাদার। শোচনীয় পরিস্থিতিটি এসে পড়ার আগেই তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে তোমাদের ইজ্জতের হেফাযত করার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের সম্ভ্রমহানির কারণে কাল তোমার ভাই অনুশোচনায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিছু ভুলের কারণে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আপনার বিরাগ তৈরি হতে পারে। কিন্তু এর জন্য জিহাদের প্রতি নারাজ হতে পারেন না। যে-সাথীরা এই মুহূর্তে মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে, তাদের আপনি সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু শহীদ সাথী ও শত্রুর হাতে আটক বন্ধুদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ ও সমবেদনা থাকা দরকার।

মুজাহিদদের ভুল-ত্রুটির কারণে যদি জিহাদ পরিত্যাগ করা জায়েয হতো, তা হলে সবার আগে তালেবান জিহাদ পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে আসত। এই অজুহাতে যদি জিহাদ বর্জন করা জায়েয হতো, তা হলে আরব সাথীরা জিহাদের কথা ভুলেও মুখে উচ্চারণ করত না।

কাজেই হে ঈমানদারগণ! অভিযোগ-অনুযোগ ও সমালোচনা এসব চলতে থাকবে। কিন্তু পরে জান্নাতে গিয়ে দেখবে, কারও প্রতি কারও কোনো বিদ্বেষ নেই। তখন সবাই সবাইকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। জিহাদের কাফেলা সব সময় সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এরা পথে কোথাও থামে না। এরা কারও অপেক্ষায় প্রহর গোনে না। কাজেই লক্ষ্য রাখতে হবে, পাছে কাফেলা যেন দূরে চলে না যায়।

ধন্য সেই মুসলমান, যে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে জিহাদের মিশনে অংশগ্রহণ করে। আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি সেই যুবকদের, যারা আফগানিস্তানে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসের মহান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আল্লাহর সমীপে দু'আ করছি, যেন তিনি সব মুসলমানকে এই কাফেলার সৈনিক বানিয়ে দেন। আমীন।

ইরাক যুদ্ধ

এটি এমন একটি আন্দোলন, যার অবস্থা দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তাতে অংশ নেওয়া মুজাহিদগণ যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ। তালেবানের পিছু হটার পর এই মুজাহিদরা অন্তরে এই আক্ষেপ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল যে, আহ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারলাম না! কিন্তু আল্লাহ তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিয়েছেন। তাদের রবের পক্ষ থেকে আদেশ এসেছে, ঘরে গিয়ে আরামে বসে থাকা চলবে না; ছুটি এখনও পাওনি; এখনও তোমাদের অনেক কাজ অবশিষ্ট আছে।

পেছনে আমরা নু'আঈম ইবনে হাম্মাদের বর্ণনা উল্লেখ করেছি যে, দাজ্জাল নিজেকে খোদা বলে ঘোষণা দেওয়ার আগে দুই বছর ইরাক শাসন করবে। এই বর্ণনাটি পড়েই আপনি ইরাক রণাঙ্গনের নাজুকতা ও গুরুত্ব অনুমান করতে পারবেন। তা ছাড়া ফোরাত ও ইরাকের অবশিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে যেসব হাদীছ আছে, তাও মুসলমানদেরকে বহু ভাবনার আহ্বান জানাচ্ছে।

ইরাকের এই গুরুত্বকে সামনে রেখে সকল ইবলিসি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম এই দেশটির উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইরাকের পূর্বে ইস্‌ফাহান (ইরান), উত্তরে তুরস্ক, উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া, দক্ষিণে সৌদি আরব, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর আর পশ্চিমে উরদুন (জর্ডান)। এভাবে ভৌগোলিক দিক থেকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে ইরাক কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে।

বর্তমানে ইরাকে বিদ্যমান মুজাহিদগণ ভবিষ্যতে মক্কা থেকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং খোরাসান থেকে নিয়ে আলগুতা ও আ'মাক পর্যন্ত সরবরাহের কাজ আঞ্জাম দেবে এবং শত্রুবাহিনীর সরবরাহ ও সেনাবহরের জন্য ভবিষ্যতে খোদায়ী গজবরূপে আবির্ভূত হবে। আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, 'কাফেররা তাদের কৌশল ঠিক করে আর আমি আমার কৌশল ঠিক করি।'

ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি গাফলতের ঘুমে বিভোর আরবদেরকে জাগিয়ে তুলেছে। এখন সেখানে প্রকাশ্যে মিম্বর ও মেহরাব থেকে জিহাদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। রাজতন্ত্রের শিকল জনসাধারণের জিহাদি চেতনাকে বেশিদিন দমিয়ে রাখতে পারবে না। আরব জনসাধারণের চেতনা ও আল্লাহওয়ালাদের তাকবীর ধ্বনিতে আরব রাজতন্ত্রের দুর্গগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্যের রূপ ধারণ করে অতিশীঘ্র ইসলামের শত্রুদের কুপোকাত করতে যাচ্ছে। জামেয়া আযহারের শিক্ষকগণ এখন এমনসব কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছেন, যেসব কথা ইতিপূর্বে তাদের মুখ থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা কল্পনাও করা যেত না। এই ঘটনা থেকেই আরব বিশ্বের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুমান করা যায়।

জামেয়া আযহারের এক শিক্ষক মিসরের একটি জাতীয় টিভি চ্যানেলে ঘোষণা করেছেন, ইহুদিদের সঙ্গে বোঝা-পড়ার একটিই পথ। তা হলো, ওদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, শায়খ, এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি বাস্তবিকই হত্যা করা? উত্তরে তিনি প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'জি'।

চেচেন জিহাদ

যারপরনাই সুসংগঠিত একটি ইসলামি আন্দোলন। এই আন্দোলন মস্কোকে অনিরাপদ বানিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এখানে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্ক সেই জাতির সঙ্গে, যারা দীর্ঘ একটি সময় ইসলামি পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ– এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিল। চেচেন মুজাহিদদের সম্পর্ক তুর্কি জাতির সঙ্গে, যার বিভিন্ন গোত্র সমস্ত মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের আত্মমর্যাদা, সাহসিকতা ও বীরত্ব অনুমান করার জন্য একটি উপমা-ই যথেষ্ট যে, কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পর কম্যুনিষ্টরা তাদের উপর এমন ঘৃণ্যতর নিপীড়ন চালিয়েছিল যে, তারা ৭০ বছর যাবত তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং কোনো মুসলমানকে মুসলমানি নাম পর্যন্ত রাখতে দেয়নি। কিন্তু মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবির ভাষায়, এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ঈমান রক্ষাকারী জাতিটি হলো এই তুর্কি জাতি। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা বংশপরম্পরায় নিজেদের ঈমান বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমানে ফরগানার উপত্যকা উজবেকিস্তানেও ইসলামি

শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। ইহুদিরা আশঙ্কা করছে, যদি চেচেন আন্দোলন সফল হয়ে যায়, তা হলে সমস্ত মধ্য এশিয়ায় ইসলামি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে, যার পর রাশিয়ার অবশিষ্ট অস্তিত্বটুকুও বিলীন হয়ে যাবে।

এই ভূখণ্ডটি সব ধরনের উপকরণে সমৃদ্ধ। খনিজ উপকরণের মধ্যে গ্যাস ও ইউরেনিয়ামের মতো সম্পদের এখানে বিপুল মজুদ রয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহপাক এই ভূখণ্ডটিকে জনশক্তি ও উর্বর জমি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। এটি সেই অঞ্চল, যেখানে ইমাম বুখারি ও ইমাম তিরমিযির মতো হাদীছবিশারদ ও মুসলিম বিশ্বের বড়-বড় ফকীহ ও সূফী জন্মগ্রহণ করেছেন, যাদের বদৌলতে আজ আমরা ইসলামি শিক্ষার মতো মহামূল্যবান নেয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছি। এই সমস্ত অঞ্চলকে মা-অরাউন্নাহুর (আমু নদীর ওপারের এলাকা) বলা হয়। আলেমগণ এই নামটির সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত আছেন।

ফিলিপাইন জিহাদ

ফিলিপাইন এমন একটি ভূখণ্ড, যেখানে ইহুদি পরিকল্পনার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ওখানে বসে তারা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছিল। কিন্তু ফিলিপাইন আন্দোলন তাদের পরিকল্পনার পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এটি এমন একটি ভূখণ্ড, যেখানে বড়-বড় ইহুদিরা এসে তাদের মিশন বাস্তবায়িত করছে। ফিলিপাইন জিহাদ তাদের পরিকল্পনাগুলোকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে না পারলেও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

কাজেই ফিলিপাইন জিহাদ ইবলিসি শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে বড় একটি সমস্যা। কারণ, এই আন্দোলন পুরোপুরি ইসলামের রঙে রঙিন আন্দোলন এবং বিজ্ঞ আলেমগণই এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এই রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের মাঝে দীনের প্রতি অনেক ঝোঁক আছে। ফলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদেরকে পশ্চাৎপদ রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন জিহাদের আলোকরশ্মি এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের হৃদয়গুলোকে নতুন এক আলোতে উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে ইসলামের অনুকূলে চলে আসছে।

কাশ্মির জিহাদ

কাশ্মির জিহাদ ও ফিলিস্তিন জিহাদের মাঝে অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। ফিলিস্তিন জিহাদ যেমন ইহুদিদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসমূহের পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধক, অনুরূপ এই ভূখণ্ডে যতদিন কাশ্মির জিহাদ চালু ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহুদিরা এই অঞ্চলে তাদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসমূহ কখনোই বাস্তবায়ন

করতে পারেনি। বর্তমানে ইহুদি পরিকল্পনার পথের সর্বশেষ প্রতিবন্ধকটি হলো জিহাদি চেতনা ও পারমাণবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তান। আর তাদের ধারণা অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে জিহাদি চেতনা ও পারমাণবিক বোমা ধ্বংস করতে হলে কাশ্মির জিহাদকে নস্যাৎ করা ইহুদীদের এক অপরিহার্য কাজ।

ইবলিসি শক্তিগুলো কাশ্মির জিহাদের এই গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিল যে, এই জিহাদের বদৌলতে শুধু এখানেই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীতে জিহাদের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। ফলে এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে অনাগত বংশধর জিহাদের স্লোগানের মধ্যেই প্রতিপালিত হবে। কাজেই বিশ্ব কুফরিশক্তি অন্য কোনো আন্দোলনের আগে এই আন্দোলনটিকে ধ্বংস করা আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত জাতিগুলোর একটি হলো কাশ্মির জাতি, যার সঙ্গে প্রতি যুগে এত বেশি নিপীড়নমূলক আচরণ করা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো জাতির সঙ্গে যেমনটি করা হয়নি। এরা এমন একটি জাতি যে, কখনও তার লাশের উপর বাণিজ্যিক প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, আবার কখনও জীবিতদেরকে ভেড়া-বকরির মতো মানবতার বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। তাও আবার জীব-জন্তুদের চেয়েও কম দামে।

আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে নির্বাচিত করেন, তখন তাকে মাটির গভীরতম তল থেকে বের করে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দেন। এই জাতিটিকেও আল্লাহ পাক জিহাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন। বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণ, মানবীয় মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণা, দার্শনিকদের দর্শন এই জাতিটির ব্যাপারে সে-সময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে, যখন তারা জিহাদের পতাকাকে উড্ডীন করেছে। মনস্তত্ত্ববিদরা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল যে, আরে, এরাই কি সেই কাশ্মিরি জাতি, যাদের একজনমাত্র সৈনিক একটিমাত্র লাঠির জোরে বকরির পালের মতো একে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত? যাদের জীবিত সদস্যদেরকে জীবজন্তুর মতো নিলাম করে দেওয়া হতো? এই জাতি যখন জিহাদের ধ্বনি তুলে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজেদের জীবনগুলোকে এপথে উপস্থাপন করতে শুরু করল, তখন বিবেক থমকে গেল, সকল বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল।

বিশ্বব্যাপী চলমান ইসলামি আন্দোলনগুলোকে যদি অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে এ বিষয়টি সপ্রমাণিত হয় যে, ত্যাগের দিক থেকে আফগান জিহাদের পর সবচেয়ে বেশি কুরবানি দিচ্ছে কাশ্মিরিরা। চৌদ্দটি বছর পর্যন্ত আপন ভিটেয় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা যেকোনো জাতির পক্ষে সম্ভব নয়।

কাশ্মির জিহাদ শুধু ব্রাহ্মণদেরই নয় – ইহুদিদেরও চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এটিও হৃদয়কাঁপানো অগণিত কুরবানিরই প্রতিফল। যারা এই জাতির ত্যাগ-কুরবানিকে কাছে থেকে দেখেছে, তারা জানে, ত্যাগ-কুরবানির কত

ময়দানে এরা কত জাতিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তা ছাড়া এই আন্দোলন সমবেদনা ও সাহায্য-সহযোগিতার এজন্য বেশি হকদার যে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যেসব আচরণ হয়েছে, হচ্ছে ও হবে, তেমনটি সম্ভবত অন্য কোনো আন্দোলনের সঙ্গে হয়নি। কী বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ইসলামের শত্রুরা এই আন্দোলনকে কেমন গভীরতার সঙ্গে বুঝেছে এবং কত দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে! কিন্তু মুসলমান আজও এই আন্দোলনটি বুঝতে সক্ষম হয়নি। হাজার-হাজার শহীদের রক্তও তাদের চোখের ধাঁধা অপসারিত করতে সক্ষম হয়নি।

এই মুহূর্তে কাশ্মির জিহাদ যেসব সমস্যা ও ঝুঁকির সম্মুখীন, তার জন্য বিজাতিদের ষড়যন্ত্রের তুলনায় আপনদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা-ই বেশি দায়ী। নিজেদের এই অনৈক্যের ফলে আজ ভারত তার মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষ্যে আমাদেরকে আলোচনার ধাঁধায় ঘুরপাক খাইয়ে চলেছে। আমাদের কন্যাদের মাথার ওড়না ভারতীয় বেনিয়াদের হাতে বিক্রি করে যাচ্ছে আর আমরা বিভোর চোখে বসে-বসে কেবল তামাশা দেখছি! সর্বত্র কবরের নীরবতা, অসারতা আর হৃদয়হীনতার রাজত্ব বিরাজ করছে।

রক্ত আমাদের ভুলিয়ে দিয়ো না

পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশীল মুজাহিদগণ তাদের কাশ্মির মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, রক্তের শেষ ফোঁটাটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত ময়দান গরম রাখব। হাত অবশ হয়ে যাবে যাক, পায়ে ফোস্‌কা পড়বে পড়ুক, তবু গন্তব্যপানে সফর অব্যাহত রাখা হবে। শরীরের টকটকে লাল রক্ত দ্বারা প্রজ্বালিত প্রদীপগুলোকে তারা কখনও নিভতে দেবে না।

কাশ্মিরিরা এখনও তাদের প্রতিজ্ঞার উপর অটল আছে। বয়সের ভারে পা দুখানা দুর্বল হয়ে গেছে, তবু সফর চালু রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আলোর শত্রু অন্ধকার সেই বাতিগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা সেগুলোকে নিভতে দেয়নি। কাশ্মিরিরা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে যাচ্ছে এবং উন্দুলুসের সেই যুবকদের মতো শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে সচেষ্ট রয়েছে, যারা আমীর গারনাতা আবদুল্লাহর সাহসহীনতা ও কাপুরুষতা সত্ত্বেও ইসলাম ও মাতৃভূমির সুরক্ষায় জিহাদ চালিয়ে গিয়েছিল এবং আপন প্রভুর দরবারে অবনত হয়ে বিজয়ের আশায় বুক বেঁধে ছিল।

কাশ্মিরি মুজাহিদরাও শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করে যেতে থাকবে। কারণ, তারা জানে, জিহাদে সফলতা শুধু অঞ্চলজয়ের নাম নয়। বরং এটি বিশ্বাসের যুদ্ধ। যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাসের উপর অটল থাকে, তাদেরই

সফল ও বিজয়ী বলা হয়। কাশ্মিরি মুজাহিদদের সামনে ইসলামের ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে তারা পড়েছে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র-থেকে-ক্ষুদ্রতর ঐতিহাসিকও মীর জাফর ও মীর সাদেককে সফল আখ্যায়িত করেনি। বরং জগত তাদেরকেই সফল বলছে, যারা নিজেদের দেহগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছে বটে; কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বেঁচে থাকব তো বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকব। জীবন যাবে, তো বিশ্বাসের জন্য যাবে। এটি কোনো রাজনৈতিক যুদ্ধ নয়। ইসলাম এ-কারণেই এর নাম দিয়েছে 'জিহাদ'।

তাগুতি শক্তিগুলো আমাদের সঙ্গে এজন্য লড়াই করছে, যেন আমরা আল্লাহর প্রভুত্বের ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সম্মুখে মাথা নত করি। বিপরীতে আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলো, এমনটি কখনই হওয়ার নয়। এই দ্বন্দ্বে যদি আমাদের জীবনও চলে যায়, তা হলে যাবে এই অবস্থায় যে, আমরা আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার উপর অটল আছি। অথচ বাতিল আমাদের সঙ্গে এই লক্ষ্যে লড়েছিল, যেন তারা আমাদেরকে আমাদের বিশ্বাস থেকে সরিয়ে দেবে। কাজেই ওহে বিবেকবান মানুষ, একটু বলো তো দেখি, মুজাহিদরা যদি কোনো ভূখণ্ডে লড়াই করতে-করতে শহীদ হয়ে যায়, তা হলে ইনসাফের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দাও, বিজয়ী কে হলো – আমরা, নাকি আমাদের শত্রুরা? অতএব, কাশ্মিরের মুজাহিদগণও ইনশাআল্লাহ জয়ী হওয়াকেই বরণ করে নেবে। তারা আপন চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের জন্য জীবন কুরবান করে জয়যুক্ত হবে।

কাশ্মির জিহাদ শুধু কাশ্মিরিদের বিষয় নয় – এটি হিন্দুস্তানের ২৫ কোটি মুসলমান ও চৌদ্দ কোটি পাকিস্তানির শান্তি, নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের গ্যারান্টি। ভারত যদি কাশ্মির জিহাদে জয়ী হয়ে যায়, তা হলে তার পরে তাদের অপবিত্র পরিকল্পনার পথে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে কাফেরদের শত্রুতা ও তাদের নাপাক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছে। আল্লাহপাক বলছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের আপনজন ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের বিপন্ন করে, তারা তা-ই তোমাদের জন্য কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে, তা আরও জঘন্য। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিষদভাবে বর্ণনা করে দিলাম; যদি তোমরা অনুধাবন কর।'[৬০]

---

৬০. *সূরা আলে ইমরান ॥ আয়াত : ১১৯*

কাজেই যাদের অন্তরে ঈমানের কিরণ জীবিত আছে, যারা মসজিদ-মাদরাসার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক, যারা নিজেদেরকে আপন বোন-কন্যাদের সম্ভ্রমের প্রহরী মনে করছে, যাদের শিরায় দেশপ্রেমের রক্ত প্রবহমান, তাদের জন্য দেশ ও জাতির সুরক্ষার ব্যাপারে সামান্যতম অলসতাও শোভা পায় না।

হাদীছগুলোতে বর্ণিত ঘটনাবলির সারাংশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জাল-বিষয়ক ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেননি। সেজন্য ঘটনাগুলো ধারাবাহিকতার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। যে-বছরটিতে হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বছরটির কিছু লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত নয়।

হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশের নিকটতম ঘটনাসমূহ

হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশ যিলহজ মাসে ঘটবে। তার আগে পবিত্র আত্মাকে শহীদ করে দেওয়া হবে। আরবের কোনো এক রাজার মৃত্যু ঘটবে এবং সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধ তৈরি হবে। রমযানে ভয়ানক আওয়াজ আসবে। যিলকদ (যিলহজের আগের মাস) মাসে আরব গোত্রগুলোর মাঝে অনৈক্য দেখা দেবে, যার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। হজের সময় হাজীদের লুণ্ঠন করা হবে এবং তাদের গণহারে হত্যা করা হবে। শামে (তথা জর্ডান, ইসরাইল ও সিরিয়া এই তিন রাষ্ট্রের কোনো একটিতে) সুফিয়ানি নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং ঈমানদারদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাবে। ফোরাতের তীরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

মহাযুদ্ধের বিভিন্ন রণক্ষেত্র

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ ও রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ক হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশের সময় কাফের ও মুসলমানদের সংঘটিতব্য যুদ্ধগুলোর মধ্যে দুটি বড় রণাঙ্গন হবে। প্রথমটি হবে আরবের গোটা ভূখণ্ড, যেখানে বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদ ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তার মধ্যে ফিলিস্তিন, ইরাক ও শাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই রণাঙ্গনে হযরত মাহ্‌দির হেডকোয়ার্টার হবে দামেশ্‌কের সন্নিকটস্থ আলগুতা নামক স্থানে, যেখান থেকে তিনি সকল মুজাহিদের কমান্ড করবেন। অপর ক্ষেত্রটি হবে হিন্দুস্তানের রণাঙ্গন। হাদীছে এই রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টারের নাম উল্লেখ নেই।

আরবের রণাঙ্গন

বিভিন্ন হাদীছের আলোকে আরব রণাঙ্গনের ক্রমধারা মোটামুটি এরূপ দাঁড়ায়–

হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশের সংবাদ পাওয়ামাত্র তাঁর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী রওনা হবে, যারা বায়দা নামক স্থানে ধসে যাবে। এই সংবাদ শুনে শামের আবদাল ও ইরাকের অলিগণ হযরত মাহ্‌দির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই বাহিনীতে এসে শামিল হয়ে যাবেন। তারপর এক কুরাইশি – যে সুফিয়ানি নামে পরিচিত হবে – নেতার আবির্ভাব ঘটবে। হযরত মাহ্‌দি তার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। এই যুদ্ধের নাম হবে 'কাল্‌ব যুদ্ধ'। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হবে। তারপর হযরত মাহ্‌দি দামেশ্‌কের সন্নিকটে আলগুতা নামক স্থানে পৌঁছে হেডকোয়ার্টার তৈরি করবেন। ইয়েমেন ও খোরাসান থেকে মুজাহিদ বাহিনী আসবে। রোমান খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করবে। তারপর উভয় সেনাদল মিলে পেছনের সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে ও জয়ী হবে।

তারপর খ্রিস্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সমস্ত কাফের পুনরায় একত্র হয়ে আসবে। তারা আ'মাকে (যার আরেক নাম দাবিক) অবতরণ করবে এবং মুসলমানদের কাছে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের দাবি জানাবে। তারপর আ'মাকে ঘোরতর লড়াই হবে। এই যুদ্ধে আল্লাহ মুজাহিদদের বিজয় দান করবেন। তারপর মুসলমানরা রোমের দিকে যাবে এবং রোম জয় করে নেবে। ওখানে তারা দাজ্জালের আবির্ভাবের সংবাদ পাবে। ফলে তারা ওখান থেকে ফিরে আসবে।

দাজ্জাল তার বিরোধী রাষ্ট্রগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে দেবে। এই সময়টি মুসলমানদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ও পেরেশানির সময় হবে। এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান জিহাদ ত্যাগ করে দুনিয়াদারির পেছনে ছুটতে শুরু করবে। এক-তৃতীয়াংশ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ দাজ্জালের কঠিন অবরোধে আটকা পড়বে। তারা ক্ষণে-ক্ষণে দাজ্জালের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতে থাকবে। অবশেষে যখন চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবে, এমন সময় ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতরণের ঘটনা ঘটে যাবে।

হিন্দুস্তানের রণাঙ্গন

অপরদিকে হিন্দুস্তানের রণাঙ্গনে মুজাহিদগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে। হাদীছে এই যুদ্ধক্ষেত্রটির বিস্তারিত বিবরণ আসেনি। তবে এই অঞ্চলে বিদ্যমান শত্রুপক্ষের অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা যায়, এই রণাঙ্গনটিও যারপরনাই ভয়ানক হবে। শুরুতে মুসলমানদেরকে অনেক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে। তারপর মুজাহিদরা হিন্দুদেরকে পরাজিত করে কেবলই সামনের দিকে অগ্রসর

হতে থাকবে। এভাবে তারা সমগ্র হিন্দুস্তানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে দেবে। তারা হিন্দুদের বড়-বড় নেতা ও সেনাপতিদেরকে জীবিক গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। যুদ্ধ সমাপ্ত করে যখন ফিরে আসবে, তখনই সংবাদ পাবে, ঈসা ইবনে মারয়াম এসে পড়েছেন।

হযরত ঈসা (আ.) মুজাহিদদের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেবেন এবং দাজ্জাল-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা (আ.)-কে দেখে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ঈসা (আ.) 'লুদ্' নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। তারপর ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে আদেশ করবেন, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি তূর পাহাড়ে চলে যাও। সেমতে ঈসা (আ.) মুসলমানদের নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাবেন। সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে একটি করে ফোড়া সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে তারা সবাই প্রাণ হারাবে। তারপর আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত অঞ্চলকে পরিষ্কার করে দেবেন।

এই ঘোরতর যুদ্ধগুলোর পর সমগ্র বিশ্বে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা তৈরি হবে। মানুষের জীবনে কোনো অশান্তি ও অস্থিরতা থাকবে না। কারও দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না। ভূমি তার ধনভাণ্ডারকে বাইরে বের করে দেবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকবে। তারপর আস্তে-আস্তে পৃথিবী থেকে ঈমানদারগণ উঠে যেতে শুরু করবে। অবশেষে যখন কেয়ামত আসবে, তখন শুধু কাফেরদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

পবিত্র কুরআনে দাজ্জালের আলোচনা

দাজ্জাল বিষয়ে মাথায় একটি প্রশ্ন জাগে, দাজ্জালের ফেতনা যদি এতই গুরুতর হবে, তা হলে কুরআন কেন বিষয়টি বর্ণনা করেনি? আলেমগণ এই প্রশ্নের নানা উত্তর দিয়েছেন। বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাত্হুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজ্র আসকালানি লিখেছেন, 'এর একটি উত্তর হলো, পবিত্র কুরআনে দাজ্জালের উল্লেখ আছে।'

যেমন বলা হয়েছে :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

'যেদিন আপনার রবের কিছু নিদর্শন আসবে, সেদিন কারও ঈমান তার কোনো উপকার করবে না।'[৬১]

৬১. *সূরা আন'আম ॥ আয়াত : ১৫৮*

তিরমিযি শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনটি বিষয় এমন আছে, যখন সেগুলো আত্মপ্রকাশ করবে, তখন ইতিপূর্বে মুমিন ছিল না এমন ব্যক্তির ঈমান আনয়ন তাকে কোনো উপকার দেবে না। সেই বিষয় তিনটি হলো– দাজ্জাল, দাব্বা ও পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া। ইমাম তিরমিযি এই আয়াতটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

তো বোঝা গেল, উল্লিখিত আয়াতটিতে দাজ্জালেরও আলোচনা রয়েছে। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ হলো কুরআনের তাফসীর। তাফসীরে কাবীতে আছে, দাজ্জালের আলোচনা কুরআনে এসেছে। আর তা হলো এই আয়াত :

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

'অবশ্যই আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বড় কাজ।' এখানে 'আন্নাস' দ্বারা উদ্দেশ্য দাজ্জাল।[৬২]

এছাড়া আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বূদে আছে, لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا (যাতে তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান) পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে মহান আল্লাহ 'বা'সুন' শব্দটিকে 'কঠোরতা' বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং বিষয়টিকে নিজের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই দাজ্জালের রব হওয়ার দাবি, তার ফেতনা ও শক্তির কারণে একথা বলা সঙ্গত যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য দাজ্জাল।

দাজ্জালের ফেতনা ও ঈমানের হেফাযত

অন্ধকার ফেতনার ভয়ানক প্রতিচ্ছবি দিন-দিন মানবতাকে গ্রাস করে চলছে। ঈমানওয়ালাদের জন্য এটি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত। কুফরের পক্ষ থেকে এদিক বা ওদিকের ঘোষণা প্রচার করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানকে একটি বিষয় বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে, পরীক্ষার এই হলটি অতিক্রম করা ব্যতীত জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

'তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি যে, তোমাদের কে জিহাদ করেছে আর কারা দৃঢ়পদ।'[৬৩]

৬২. *ফাত্হুল বারী ॥ খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৯২*
৬৩. *সূরা আলে ইমরান ॥ আয়াত : ১৪২*

এটি আল্লাহপাকের বিধান। আল্লাহর বিধান কখনও পরিবর্তন হয় না। আপনি হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জাল-বিষয়ক হাদীছগুলো পড়েছেন। সবগুলো হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত মাহ্‌দি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ। আবির্ভূত হয়ে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের নেতৃত্বে দেবেন। এ-কারণে প্রত্যেক মুসলমানকে আপন-আপন ঈমানের ভাবনা ভাবা দরকার। নিজের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য অন্তরে জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে তার জন্য বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। জিহাদের জন্য মহান আল্লাহ জিহাদি প্রশিক্ষণের আদেশ প্রদান করেছেন। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, হযরত মাহ্‌দির যুগ তো এখনও অনেক দূরে, আরও বিলম্বে প্রস্তুতি নিতে দোষ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি।

আল্লাহ পাক বলেছেন :

لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً

'তারা (মুনাফিকরা) যদি (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে অবশ্যই তারা এ-কাজের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করত।'[৬৪]

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে ইবলিসি শক্তিগুলোর মিথ্যা মাহ্‌দিকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করতে পারে। কাজেই রাসূলে মাদানি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাহ্‌দির যেসব আলামত বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে সামনে রেখে ঘটনার বাস্তবতা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলো অনুসরণ করে চললে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

১. দাজ্জালের যুগে বাস্তবতা ততটা হবে না, যতটা চলবে গুজব ও অপপ্রচার। এই প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হবে আধুনিক প্রচারমাধ্যম। যেমন– পত্রিকা, রেডিও, টিভি, টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি। কাজেই এই আধুনিক কমুনিকেশন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধাদি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে বরং এখন থেকেই এমন অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, কাল যদি আপনি এসব প্রযুক্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তা হলে এসব পরিত্যাগ করতে যেন আপনাকে কোনো সমস্যায় নিপতিত হতে না হয়। কাজেই এসব আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা যত কমানো যায়, আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ততই কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

২. দাজ্জালি মিডিয়া যারা পড়ে ও শোনে, তারা সাধারণত নিজের মাথায় চিন্তা করে না। বরং ওসব মিডিয়ার সংবাদ, ছবি ও পর্যালোচনা-ই তাদের মন-মস্তিষ্কের

---

৬৪. সূরা তাওবা ॥ আয়াত : ৪৬

উপর পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তাই ওসব প্রচারমাধ্যম থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৩. এযুগে দাজ্জালি শক্তিগুলো ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এত বেশি প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে এই অপপ্রচারের জোরে সত্য চাপা পড়ে থাকে। এজন্য পশ্চিম মিডিয়ার সূত্রে যদি আপনার কানে কোনো সংবাদ আসে, তা হলে পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংবাদটি অন্যের কানে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আপনি দাজ্জালি শক্তিগুলোর অপপ্রচারের ক্রিয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত নাও যদি হতে পারেন, অন্তত তার শক্তি তো অবশ্যই দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবেন।

পবিত্র কুরআন কাফেরদের এই প্রচেষ্টার কথা এভাবে বর্ণনা করেছে :

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ

'তোমরা যখন সংবাদটি শুনেছ, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে সুধারণা করল না কেন? আর কেন একথা বলল না যে, এটি তো সুস্পষ্ট এক অপবাদ?'[৬৫]

অপর এক আয়াতে শোনা-সংবাদ পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে মুখ থেকে বের করারও নিন্দাবাদ করা হয়েছে।

৪. যখন কোনো বিষয়কে দাজ্জালি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে সন্দিগ্ধ বানিয়ে দেওয়া হবে এবং বিষয়টি ঠিক, না ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে, তখন আধুনিক বস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে তথ্য জানার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কেননা, পরিস্থিতিকে যারা দাজ্জালের চোখে দেখে আর যারা আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে, উভয়ে সমান হতে পারে না।

যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন :

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

'আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার রবের আলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্তি অন্যদের মতো হতে পারে না।'[৬৬]

বর্তমান যুগের একাধিক ঘটনা প্রমাণিত করে দিয়েছে, যাদের তথ্য জানার একমাত্র উপায় প্রচারমাধ্যম, তারা সত্যের সন্ধান পায় না। বরং তারা যেসব সংবাদ-বিশ্লেষণ পড়ে ও শোনে, তা-ই তাদের দৃষ্টিতে সত্যে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে তারা আল্লাহর বাহিনীর পরিবর্তে ইবলিসের বাহিনীকে শক্তি জোগাচ্ছে।

---

৬৫. সূরা নূর ॥ আয়াত : ১২
৬৬. সূরা যুমার ॥ আয়াত : ২২

অনেক সময় শিক্ষিতজনদের বিশ্লেষণ এমন হয়ে থাকে যে, তাদের বিবেকের জন্য আক্ষেপ করা ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না।

৫. হৃদয়ের স্ক্রিনটিকে ওয়াশ করে নিন। বিবেকবান মুসলমান ভাইয়েরা যখন পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ বুঝে ফেলবে এবং তাদের টিভি ও কম্পিউটারের স্ক্রিনের ঘটনাচিত্র মনে সংশয় তৈরি করতে শুরু করবে, তখন ডানে-বাঁয়ে না দেখে নিজের বক্ষে স্থাপিত ক্ষুদ্র স্ক্রিনটিকে ওয়াশ করে নেওয়াই অধিকতর উত্তম হবে। তারপর দেখবেন, পরিষ্কার হওয়ার পর এই ক্ষুদ্র স্ক্রিনটি আপনাকে এমন দৃশ্যাবলি দেখাতে শুরু করবে, যা আপনি গোটা জীবন আধুনিক-থেকে-আধুনিকতর প্রযুক্তি ব্যবহার করেও দেখতে পারতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

'ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তা হলে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরকান' দান করবেন।'[৬৭]

এই 'ফুরকান'ই সেই স্ক্রিন, যার পর্দায় সাধারণ চোখে দেখা যায় না এমনসব বিষয়ও পরিদৃশ্য হতে শুরু করে। মালায়ে আ'লা তথা খোদায়ী শক্তির সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যায়, যেখানে জগতের ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়াদি চূড়ান্ত হয় এবং আল্লাহর তাজাল্লি নিপতিত হয়। মহান আল্লাহর তার বান্দাদেরকে দূরদৃষ্টি দান করেন। অবশেষে বান্দার আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে শুরু করে।

৬. দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পেতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা কাহ্ফের প্রথম দিককার আয়াতগুলো পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আপনি এই আয়াতগুলো মর্ম বুঝে পাঠ করুন। দেখতে পাবেন, এই আয়াতগুলোতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

(ক) আল্লাহর হাম্দ ও ছানার পর কুরআনুল কারীম সত্য নবীর উপর নাযিল হওয়া।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন...'

(খ) আল্লাহর নাফরমান বান্দাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সংঘটিতব্য অতিশয় কঠিন ও কষ্টদায়ক শাস্তির ভয় দেখানো।

لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا

'যাতে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান।'

৬৭. *সূরা আনফাল ॥ আয়াত : ২৯*

(গ) সকল অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যকারীদেরকে অনন্ত জীবনের সুখ ও শান্তির সুসংবাদ।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

'আর তিনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাবেন, যারা...।'

(ঘ) সেই লোকদেরও কঠিন পরিণতির ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ পুত্রসন্তান গ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস পোষণ করে।

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

'আর ভয় দেখাবেন তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

(ঙ) দুনিয়ার জাঁকজমককে ভঙ্গুর আখ্যায়িত করে দুনিয়াবিমুখতা ও তাক্ওয়া অবলম্বনের উপসাহদান।

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

'তার উপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব।'

(চ) আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা করে তার চেয়েও বড় ঘটনা শোনার জন্য মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করা।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

'তুমি কি মনে কর, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নির্দেশনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর?'

(ছ) আসহাবে কাহ্ফের দু'আ :

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

'হে আমাদের রব, তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করো।'

এই দু'আর মধ্যে সত্য সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লে তখন আল্লাহর সমীপে দুটি বস্তু প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

১. হে আমাদের রব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন।

২. আমাদের বিষয় আশয়ে, যেমন– বাতিলের বিরোধিতা ও সত্যের অনুসরণ এসব কাজে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করুন।

এই আয়াতগুলো প্রতিদিন তিলাওয়াত করে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে সে মোতাবেক আমল করুন। আয়াতগুলোকে মুখস্থ করে নিলে অনেক সুবিধা হবে।

৭. তাক্ওয়া অবলম্বন করুন। তাক্ওয়ার মূল হলো হালাল জীবিকা। তাই হারাম পরিহার করে চলুন। এমনকি সংশয়পূর্ণ বস্তু থেকেও দূরে থাকুন। বর্তমান যুগে তাক্ওয়া অবলম্বন করা খুবই জরুরি। নিজেকে সেইসব আমলের পাবন্দ বানিয়ে রাখুন, যার ফলে আল্লাহর রহমত বান্দাকে সব সময় আচ্ছাদন করে রাখে। যেমন– সব সময় অজু সহকারে থাকা, নামায শেষ করার পর কিছু সময় জায়নামাযে বসে থাকা, তাহাজ্জুদ পড়া, বিশেষ করে যেসব লোক দীনি কোনো কাজে দায়িত্বরত আছেন, তাদের জন্য তো তাহাজ্জুদ নামায খুবই জরুরি আমল।

৮. আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিত তরজমা ও তাফসীরের সঙ্গে পবিত্র কুরআন পাঠ করুন আর নিজের অন্তরকে আলোকিত রাখতে ও সত্যের কাফেলায় শামিল থাকতে সত্যাশ্রয়ী আলেমগণের সাহচর্য অবলম্বন করুন এবং সব সময় সত্যপন্থীদের পথ অনুসরণ করুন।

৯. দীনের চর্চায় মসজিদগুলোর ভূমিকাকে সক্রিয় করুন। বিশ্ব কুফরি প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রচেষ্টায় রত আছে যে, মুসলমানদের জীবন থেকে মসজিদের ভূমিকাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যেই তারা আলেমসমাজ ও ধার্মিক শ্রেণীর লোকদেরকে নানা পন্থায় বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মোকাবেলায় প্রতিটি মসজিদে কুরআনের দর্স চালু করুন।

১০. যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, হযরত মাহ্‌দির আমলে যা কিছু সংঘটিত হবে, পূর্ব থেকেই সেসবের আগাম প্রস্তুতি ঈমানের চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। যেমন– নিজেকে গরম ও ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত বানানো, লাগাতার কয়েক দিন পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করা, রাতে পাহাড়ে চলাচল করার সাহস ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ঘোরতর যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া, পাহাড়ি জীবনের সঙ্গে নিজের স্বভাব-চরিত্রকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, নিজের মধ্যেও এবং পরিবার-পরিজনকেও আল্লাহর পথে কুরবানি দেওয়ার লক্ষ্যে এখনই প্রস্তুত করতে থাকা ইত্যাদি।

কবি ইকবাল বলেছেন–

چو می گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لا الہ را

'আমি যখন বলি, আমি মুসলমান, তখন আমি শিউরে উঠি। কারণ, আমি জানি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি পূরণ করা কত কঠিন।'

নাজুক পরিস্থিতি ও মুসলমানদের দায়িত্ব

হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীছগুলো পড়া ও বুঝবার পর এখন এ-বিষয়টি অতি অনায়াসে বুঝে আসছে যে, এ-সময়ে পৃথিবীর মঞ্চে যা কিছু ঘটবে, এসব সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই। বর্তমানে ইবলিসের সমস্ত শ্রম ও শক্তি এই

কাজে নিয়োজিত আছে যে, সারা পৃথিবীতে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, যাতে সে (তার ধারণামতে) মানবেতিহাসকে ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং আল্লাহর কাছে সপ্রমাণিত করে দেবে যে, তোমার সাধের বান্দারা তোমার দেওয়া দায়িত্ব পরিপালনে সফল হয়নি।

ইবলিসের এই মিশনে তার পুরনো বন্ধু, আল্লাহর শত্রু ও মানবতার দুশমন ইহুদিরা সকলের আগে-আগে রয়েছে। ইবলিসের সমস্ত চেলা-চামুণ্ডা – চাই তারা জিনভুক্ত হোক কিংবা মনুষ্যভুক্ত – পরিপূর্ণরূপে তাদের সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। এখন তারা স্পষ্ট ভাষায় বলতে শুরু করেছে, তাদের যুদ্ধ মিশন পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়ে যাবে।

'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যাব' এই বাক্যটি আমরা বুশ থেকে শুরু করে অন্যান্য কাফের নেতাদের মুখ থেকে বারবার শুনছি। আমি ঘুমন্ত মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ওহে গাফলতের মরুভূমিতে পথহারা পথিকদল, ওহে বিপদ চোখের সামনে দেখার পরও চোখ বুজে পড়ে থাকা মানুষের দল, বলো তো, কাফেরদের সেই মিশনটি কী, যেটি এখনও সম্পন্ন হয়নি?

মিশন যদি তালেবানের পতন ছিল, তা হলে তারা তো ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

মিশন যদি ইরাকের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা ছিল, তা হলে তাও তো ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু তারপরও এখনও তারা বলছে 'মিশন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে'।

এর অর্থ হলো, মিশন সম্মুখে অন্যকিছু।

কুফরের নেতারা সেই মিশনকে সম্পন্ন করতে চাচ্ছে।

আল্লাহর সৈনিকদের প্রত্যয়

কিন্তু দাজ্জালের কর্মীবাহিনী যেমন মিশন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পিছপা হওয়ার ইচ্ছা রাখে না, তেমনি আল্লাহর মুজাহিদগণও আপন মিশনে পৌঁছানো পর্যন্ত ময়দানে অবিচল থাকবে। ইহুদিরা যে-দিনটির অপেক্ষা করছে যে, যখন তাদের খোদা দাজ্জাল আগমন করবে, তখন সারা বিশ্বে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সেই দিনটি প্রকৃতপক্ষে তাদের ধ্বংসের শেষ দিন হবে। সেদিন গাছ-পাথরও তাদেরকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানাবে।

আল্লাহর মিশনকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ঈমানদারগণ সারা বিশ্বে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মিশন এক; কিন্তু অঙ্গন বিভিন্ন; যুদ্ধ একটি; কিন্তু ভূখণ্ড একাধিক। দুশমন এক; কিন্তু চেহারা ভিন্ন-ভিন্ন। তাঁরা জিহাদ করছে, করতে থাকবে এবং জয় কিংবা শাহাদাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। না

শত্রুর শক্তি তাদের প্রত্যয়-পরিকল্পনাকে দুর্বল করতে পারবে, না আপনদের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের অগ্রযাত্রাকে অবদমিত করতে সক্ষম হবে।

এটি প্রতিজ্ঞা ও সাহসের সেই পাথর, যার সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে রাশিয়ার লাল বাহিনী নিজেদের মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে।

এটি চেতনা ও সাহসিকতার সেই ঝড়, যার থেকে বেরিয়ে আসা বজ্র দাজ্জালি শক্তির সামরিক ও অর্থনৈতিক গৌরবের নিদর্শনগুলোকে (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন) গুড়িয়ে দিয়েছে।

এটি আল্লাহর শত্রুদের একটি কর্মফল, যারা যখন শাস্তি দিতে মাঠে নামে, ত্যখন তারা পারমাণবিক বোমার অপেক্ষা করে না; বরং নিজেদের দেহগুলোকে বোমা বানিয়ে আল্লাহর শত্রুদেরকে উড়িয়ে দেয়।

খোদায়ী মদদ যাদের চোখের সামনে ভাসমান থাকে, শত্রুর শক্তিতে তারা ভীত হয় কীভাবে?

জাতির পবিত্র আত্মাগুলো যাদের মাথায় হাত বোলায়, তারা হতাশ হয় কী করে?

সেই পাগলগুলো কী করে সাহস হারাতে পারে, যাদের মায়েরা তাদের শহীদি মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গোনে?

হ্যাঁ, এখন তো বোনরা তাদের ভাইদের শাহাদাতে আনন্দিত হতে শুরু করেছে। ভাইদের মিশনে বোনরা অংশ নিতে শুরু করেছে। এখন তো সেই যুবকদের সাহসিকতা আগের চেয়ে আরও উঁচু হয়ে গেছে যে, মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদসমূহ কুড়ানোর সময় এসে পড়েছে। এই মুহূর্তে নানা সমস্যা, সংকট ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মিশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আল্লাহর সৈনিকগণ আফগানিস্তান, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, ইরাক, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া ও অন্যান্য রণাঙ্গনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

তারা কাজের মাধ্যমে প্রতিজন ঈমানদারকে আহ্বান জানাচ্ছে, হে আত্মভোলা মুসলমানগণ, আসো, আমরা তোমাদেরকে সেই সুখ ও সৌন্দর্যের সন্ধান দিতে চাই, যার জন্য মানুষ রূপসী নববধূকে বাসরঘরে ফেলে ময়দানে ছুটে যায়।

ওহে দুনিয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা আত্মহারা মুসলমানগণ, আসো, আমরা তোমাদেরকে এমন নেশা পান করাব, জান্নাতে গিয়েও তোমরা যার ক্রিয়া ভুলতে পারবে না।

ওহে, যারা নিজেদেরকে ব্যবসার মাঝে ডুবিয়ে রেখেছ, আসো, আমরা তোমাদের এমন ব্যবসার সন্ধান দেব, যার মাঝে লাভ ছাড়া লোকসান বলতে কিছু নেই।

ওহে মুসলমানদের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা জিহাদের পথের পথিক হয়ে যাও; দেখবে, জগতের সকল রাজত্ব তোমাদের পায়ে এসে হুমড়ি খাবে।

ওহে মুহাম্মদে আরাবির উম্মতেরা, তোমরা ঈমান বাঁচাতে জীবন বিলিয়ে দাও। জীবনরক্ষার খাতিরে ঈমানকে বলি দিয়ো না। আল্লাহর সৈনিকদের সাহায্য দাও – যে যেভাবে পার। আর নিজেদেরও প্রস্তুত করো। কারণ, হযরত মাহ্‌দির সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য তার কপালে জুটবে, যুদ্ধের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে নিজেদের কানগুলোকে ডেইজি কাটার ও কুজের গোলায় অভ্যস্ত বানিয়ে ফেলো, যাতে জাহান্নামের গোলা থেকে রক্ষা পেতে পার। এটি বিশেষ কোনো দলের বাহিনী নয়। এটি সব মুসলমানের বাহিনী। এদের সমর্থন ও সাহায্য করা কালেমা পাঠকারী প্রতিজন মানুষের উপর ফরজ।

এরা তোমাদেরই সন্তান। সকল ভেদাভেদ ভুলে, ব্যক্তি অহমিকার প্রাচীরকে চুরমার করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসে পড়েছে।

ফেরেশতারা তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে।

হূরগুণ সেজে-গুজে তোমাদের পথপানে তাকিয়ে আছে।

যারা তোমাদের আগে শাহাদাতবরণ করেছে, তারা তোমাদের সুসংবাদ শোনাচ্ছে, আমাদের ভয়-চিন্তা সব দূর হয়ে গেছে; তোমরা আসো আমাদের পথে – বেছে নাও চির শান্তির সরল পথ।

দাজ্জালের ফেতনা ও মহিলাদের দায়িত্ব

মুসলমানদের ঘরগুলো ইসলামের সেই দুর্গ, যেগুলো কঠিন-থেকে-কঠিনতর সময়েও ইসলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মর্যাদাকে সুরক্ষিত রেখেছে। এমনকি এই দুর্গগুলো সেই সময়ও ইসলামকে হেফাযত করেছিল, যখন মুসলমান পুরুষদের বাহিনী প্রতিটি রণাঙ্গন থেকে একের-পর-এক পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করে চলছিল।

যদি খেলাফতে ওছমানিয়ার পতনের (১৯২৩ সাল) পর থেকে এ-সময় পর্যন্তকার ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ আমাদের ঘরগুলোরই মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরগুলোই মুসলিম সমাজকে এ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। বহু মুসলিম ভূখণ্ডে এমনও ঘটেছে যে, এই সর্বশেষ দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এমনকি মসজিদ-মাদরাসাগুলো পর্যন্ত কাফেরদের দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গগুলোতে অবস্থানরত ইসলামি বাহিনীগুলো সাহস হারায়নি এবং নিজ-নিজ রণাঙ্গনে দৃঢ়পদে টিকে রয়েছে।

ইসলামের এই দুর্গগুলোতে যে-বাহিনী আছে, তারা হলো মুসলিম নারীদের বাহিনী, যারা ইসলামের জন্য সেই মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে, যা ইসলামবিরোধীদের হাজারসালা প্রচেষ্টার পর আজও অটুট রয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি যে-পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তা মানবেতিহাসের

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের দায়িত্বও আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। ঈমানদার মা ও বোনদেরকে এখন আগের তুলনায় বেশি চেতনা, সাহসিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের শত্রুরা আপনার মোকাবেলায় একনাগাড়ে ৮০ বছর যাবত পরাজয় বরণ করে আসছে। এসব পরাজয় থেকে তারা এই ফলাফলে উপনীত হয়েছে যে, মোকাবেলা করে এই বাহিনীটির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না – আমাদেরকে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবার তারা যে-কৌশলটি অবলম্বন করেছে, তা হলো, মুসলমানদের ঘরগুলোতে যে-ইসলামি বাহিনীটি অবস্থান নিয়ে আছে, তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দিতে হবে। এই কৌশলটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো মনোমুগ্ধকর স্লোগান নিয়ে দরদী বন্ধুর রূপ ধারণ করে তারা আপনার সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! সময়ের নাজুকতা ও শত্রুপক্ষের ধোঁকা-প্রতারণা উপলব্ধি করে আপনাদেরকে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। আপন দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে উদাসীন হবেন না। মুসলমান পুরুষদের বাহিনী, যারা আপন দায়িত্ব থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, যারা মানসিকভাবে পরাজয়ের শিকার হয়ে আছে, হতাশার কালো মেঘ যাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে, আপনারা মহিলাদেরকে আল্লাহপাক এই যোগ্যতা দান করেছেন যে, আপনারা পলায়মান এই বাহিনীটিকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারেন, তাদের অবশ বাহুগুলোতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, ভীত-সন্ত্রস্ত পুরুষদের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে কর্তব্য পালনের উপযোগী বানিয়ে তুলতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সত্তাগতভাবেই একটি সংগঠন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। একজন নারী মানেই একটি সংগঠন। এ-কারণে দাজ্জালের ফেতনার বিরুদ্ধে আপনারা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।

সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানো এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় ইসলামি নীতি-আদর্শের প্রহরী হিসেবে গড়ে তোলা মহিলাদেরই দায়িত্ব। সন্তানদের মন-মস্তিষ্ককে শৈশব থেকেই একথাটি বসিয়ে দিতে হবে যে, তার ঈমান জগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। কাজেই ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে যদি সমগ্র পৃথিবীকেও কুরবান করে দিতে হয়, তা হলে অকুণ্ঠচিত্তে তা করতে হবে। তবুও ঈমানের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেওয়া যাবে না।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ مَا عَدَتْ اِمْرَأَةٌ فِيْ رَبْعَتِهَا بِأَفْضَلَ لَهَا مِنْ مِيْضَأَةٍ وَنَعْلَيْنِ وَيْلٌ لِلْمُسَمَّنَاتِ وَطُوْبٰى لِلْفُقَرَاءِ اَلْبِسُوْا نِسَائَكُمُ الْخِفَافَ الْمُنَعَّلَةَ وَعَلِّمُوْهُنَّ الْمَشْيَ فِيْ بُيُوْتِهِنَّ اِنَّهُ يُوْشِكُ اَنْ يَّحْوِجْنَ اِلٰى ذَالِكَ

হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম কালায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একজন নারীর নিজ গৃহের মাঝে ছুটে বেড়ানো তার জন্য লোটা ও জুতাজোড়া অপেক্ষা উত্তম। স্থূলকায়া নারীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। সুসংবাদ গরিব মহিলাদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করাও আর তাদেরকে তাদের ঘরের মাঝে হাঁটা-চলা করার প্রশিক্ষণ দাও। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে তারা এ-কাজটি করতে বাধ্য হতে পারে।[৬৮]

এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুসলিম নারীদেরকে আরামপ্রিয় না হওয়া উচিত। বরং তাদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করে নিজঘরে হাঁটা-চলা করে জীবন অতিবাহিত করায় অভ্যস্ত হতে হবে, যাতে শরীরটা ক্ষীণ থাকে। কারণ, তাদের জীবনে এমন পরিস্থিতি আগমন করতে পারে যে, তখন নিজের সম্ভ্রম ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে তাদেরকে পাহাড়-বিয়াবানে পায়ে হেঁটে সফর করতে হবে। যেমনটি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও কাশ্মির প্রভৃতি দেশে ঘটেছে।

এই বর্ণনা অনুযায়ী আমল করার পাশাপাশি বিগত আলোচনাগুলোতে যা কিছু পাঠ করেছেন, সে মোতাবেক নিজেও আমল করুন এবং গোটা পরিবার ও বংশের লোকদের মাঝে যথারীতি অভিযান পরিচালনা করুন। দাজ্জালের মহা ফেতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজেও সজাগ-সচেতন থাকুন, অন্যদেরও সচেতন করে তুলুন।

আমি আপনাদের দোহাই দিচ্ছি ইরাকের অসহায় মায়েদের, ফিলিস্তিনের সেই বোনদের, যাদের হাতের মেহেদি শুকানোর আগেই তাদের সোহাগ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে।

আমি আপনাদের দোহাই দিচ্ছি, কাশ্মির ও আফগানিস্তানের সেই কন্যাদের, যারা জীবনের প্রতিটি পলক ও প্রতিটি মুহূর্ত বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে।

আমি আপনাদের দোহাই দিচ্ছি সেই নিষ্পাপ শিশুদের, যারা খোলা আকাশের নিচে মা!-মা! করে চিৎকার করছে; কিন্তু তাদের মায়েদেরকে ইসলামের শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আপনারা নারীরা মায়াশীল হয়ে থাকেন। আপনাদের মাঝে ঈছার (নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণ) ও কুরবানির জযবা পুরুষদের তুলনায় খানিক বেশি থাকে। তাই ইরাকের মা-বোন, ফিলিস্তিনের শিশু ও কাশ্মির-আফগানিস্তানের কন্যাদের স্মরণে আপনাদের শিউরে ওঠা দরকার যে, না জানি এই বিপদ কবে কার মাথার উপর এসে হাজির হয়!

মহান আল্লাহ সমস্ত মুসলিম মা-বোনদেরকে হেফাজত করুন।

৬৮. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫১

ইসলাম আপনার কাছে আপনার শক্তির চেয়ে বেশি কুরবানি চায় না। কাজেই আপনার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সর্বাবস্থায় আপনাকে ততটুকু করে যেতে হবে। আপনাকে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আপনার জিম্মাদারি পালন করে যেতে হবে। ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদটিকে কোনো কুরবানি ছাড়া বাঁচানো যায় না। বরং এর জন্য প্রত্যেক ঈমানদারকে সেইসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

জানি, এই চরিত্র অবলম্বন করতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। মনের উপর প্রবল চাপ তৈরি করতে হবে। কিন্তু মনে রাখবে, এ-যুগে যারা সেই যুগের মতো দুর্দশা বরণ করে নিয়ে সত্যের উপর অবিচল থাকবে, তাদের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযীলতও তত বেশি ঘোষণা করেছেন।

কাজেই মনটাকে শক্ত করার জন্য, দায়িত্ব পালনে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ঈমানদারকে জিহাদের ফযীলত, মুজাহিদের পুরস্কার ও শহীদের মর্যাদাবিষয়ক আয়াত ও হাদীছসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে, যাতে মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর ওয়াদাসমূহের বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, দাজ্জাল যতই শক্তিশালী হোক-না কেন, সত্যের অনুসারীদেরকে সত্যের পথ থেকে হটাতে সক্ষম হবে না। বাতিল যতই সমারোহ করে আত্মপ্রকাশ করুক-না কেন, সব সময় বাতিলই থাকবে এবং সত্য যতই সহায়হীন পরিদৃশ্য হোক-না কেন, বিজয় তারই হবে।

এই পুস্তকে যা কিছু বর্ণনা করা হলো, এটি এক 'গরিবে'র হৃদয়ের বেদনা, যাকে আপনাদের সম্মুখে বের করে রাখা হলো।

এটি সমস্ত 'গরিবের' জীবনের সাকুল্য পুঁজি।

ভাঙা-চোরা এই শব্দগুলো হৃদয়ের সেই আর্তি, সেই হেঁচকি, যা যুদ্ধপ্রিয় যুবকদেরকে 'গরিব' বানিয়ে দিয়েছে।

এগুলো সেই অশ্রু, যা কলমের পথে শুধু এজন্য নির্গত হয়েছে যে, হয়ত জাতির কঠিন হৃদয়গুলোকে গলাতে সক্ষম হবে। হয়তবা এই বেদনা প্রতিটি অন্তরে ঢুকে যাবে এবং প্রতিজন মুসলমান সময়ের নাজুকতা উপলব্ধি করে সম্বিৎ ফিরে পাবে যে, আমাদের সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত সকল মুসলমানকে আপন-আপন দায়িত্ব পালন করার তাওফীক দান করুন। সবাইকে দাজ্জালের মহা ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদের প্রত্যেককে সত্যের সঙ্গে আঁকড়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

॥ সমাপ্ত ॥

॥ সমাপ্ত ॥